ব্রহ্মানন্দ ও রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩, গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

প্রকাশক
শ্রীমানস প্রসূন চট্টোপাধ্যায়
সম্পাদক—মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটি
৩, গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

গ্রন্থ লিখন—
আরম্ভ ঃ ১৪ই কার্ত্তিক, ১৩৪৬ সাল
৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৯ খৃঃ

সমাপ্তি ঃ ২১শে অগ্রহায়ণ ১৩৪৬ সাল
৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯ খৃঃ

লিপিকার—শ্রীবিধু ভূষণ ঘোষাল

প্রথম সংস্করণ
১৩ই চৈত্র, ১৩৭১ সাল

মুদ্রাকর—শ্রীনিমাইচরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস
১৯।এ।এইচ।২, গোয়াবাগান ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটির অক্লান্ত
কর্ম্মীদিগের উদ্দেশ্যে এই
পুস্তক উৎসর্গীকৃত
হইল।

শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়

ভ্রম সংশোধন

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	১১	কাযে	কার্যে
৩	২০	রাখালরাজ	রাখাল চন্দ্র
৪	১৬	ভূবন	ভুবন
৪	১৮	মনমোহন	মনোমোহন
২০	২	অদ্ভূত	অদ্ভুত
৩২	২	আকাঙ্খা	আকাঙ্ক্ষা
৩৩	১৩	নিরবচ্ছিন্ন	নিরবচ্ছিন্ন
৪৩	৯	বাডী	বাড়ী
৪৪	১১	প্রমণ্য	প্রণম্য
৪৬	২৩	তামসা	তামাসা
৪৭	৩	গুড়গুডির	গুড়গুড়ির
৪৭	২৫	পরস্পর	পরস্পর
৪৮	৯	খাওইতে	খাওয়াইতে
৫৬	৫	ইহ	ইহা
৫৭	১২	ত্রৈলক্যনাথ	ত্রৈলোক্যনাথ
৬০	১৭	পরামানন্দ	পরমানন্দ
৭২	১০	চাটুর্যে	চাটুজ্যে

সূচীপত্র

যে আগন্তুক সকল ব্যক্তিকে একটা হাসির গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়া নিজে স্থির হইয়া বসিয়া জপ করিতেন। বালক অবস্থায়ও যাহা দেখিয়াছি পরে উন্নত অবস্থাতেও তাহা অপররূপে প্রকাশ পাইয়াছিল এইরূপে স্বভাবসিদ্ধ ধ্যানী ও যোগীভাব বালকোচিত চাপল্যের ভিতর থাকিত এবং নিজের মজ্জাগত ভাব মাঝে মাঝে প্রকাশ পাইত।

নরেন্দ্রনাথ এই সময়ে অম্বুগুহের আখড়ায় কুস্তি লড়িত। কাঁসারি পাড়ায় যোগেন পালের আখড়ায় অর্থাৎ এখন যেখানে ট্রেনিং একাডেমি ও অপর বাড়ী হইয়াছে ঐখানে জিমন্যাস্টিক করিত এবং এখন যেখানে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ হইয়াছে ঐ স্থানে চোর-বাগানের ঘোষেদের পুকুর বুজাইয়া মাঠ হইলে নবগোপাল মিত্রের জিমন্যাসটিকের আখড়া হওয়ায় নরেন্দ্রনাথ এখানেও জিমন্যাসটিক করিত এবং হেদুয়ার পুকুরে কখনও বা নৌকার বাইচ খেলিত। আবার সময় হইলে একাগ্র ও নিবিষ্ট মনে পড়াশুনা করিত। ইহা ছাড়া গানেতেও তাহার খুব সখ ছিল বলিয়া অপর জায়গায় গান শিখিতেও যাইত। এই হইল নরেন্দ্রনাথের বাল্যকালের কিঞ্চিৎ আভাস। যুবা রাখালরাজ পড়িবার ঘরে একসঙ্গে পড়িত এবং তাহার নরেন্দ্রনাথের সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা হইল। নরেন্দ্রনাথের সহিত মিশিয়া যুবা রাখালরাজ অম্বুগুহের আখড়ায় কুস্তি লড়িতে যাইত। কুস্তির প্যাঁচ বেশ শিখিয়াছিল এবং জীবনের শেষ অবস্থায়ও তাহার কুস্তির সখ ছিল এবং কুস্তির প্যাঁচ দেখাইতে পারিত।

তখন খাবারের দর ছয় আনা করিয়া সের ছিল। যুবা রাখাল কুস্তি লড়িয়া আসিয়া একঠোঙা নোনতা খাবার আনিত; আমি এক গ্লাস জল ও পান আনিয়া দিতাম। খাবার খাইয়া পড়িতে বসিত। আমরা রাত্রে টেবিল চেয়ারে বসিয়া পড়িতাম, কিন্তু যুবা রাখাল টেবিলে পড়িতে না বসিয়া তেলের গ্লাস নামাইয়া তক্তপোষে বসিয়া পড়িত। প্রথমে বসিয়া বসিয়া পড়া, তারপর তাকিয়া মাথায় দিয়া

পড়া ও খানিকটা পর ঘুমাইয়া পড়া। আমি বইটা ও তেলের গ্লাসটা টেবিলের উপর রাখিয়া দিতাম। যুবা রাখাল নাক ডাকিয়া ঘুমাইত। আমি একদিন বিরক্ত হইয়া বলিলাম—'এই ছেলেটার পড়াশুনায় মন নাই, পড়িতে বসিলেই ঘুমোয়, এটার পড়াশুনা হবে না।' এই কথা প্রসঙ্গক্রমে একদিন বেলুড় মঠে বলায় দুই জনে খানিকক্ষণ হাসিয়া ছিলাম।

একটি বিশেষ জিনিস লক্ষ্য করিতাম যে, নরেন্দ্রনাথ যখন দর্শন শাস্ত্র বা উচ্চ ভাবের কথা বলিত, যুবা রাখাল তখন এক মনে, এক প্রাণে কথাগুলি শুনিত; কখনও প্রত্যুত্তর বা প্রতিবাদ করিত না। ঠিক যেন কথাগুলি গিলিয়া ফেলিত এবং একদৃষ্টে নরেন্দ্রনাথের মুখের প্রতি চাহিয়া থাকিত। নরেন্দ্রনাথের স্বাভাবিক ভাব হইল একের নেতৃত্বের বা কেন্দ্রস্থানীয় লোকের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করা, তাহার আদেশ অবিচলিত চিত্তে পালন করা ও নিঃস্বার্থ হইয়া অর্থাৎ নিজের লাভ উপেক্ষা করিয়া পরের জন্য কর্ম করা। তৃতীয় ভাব হইল, যে তাহার সম্পর্কে আসিবে তাহাকে আপনার করিয়া লওয়া এবং সকলকে সমান অধিকার দেওয়া অর্থাৎ কাহাকেও ছোট বড় করিবে না। চতুর্থ ভাব হইল নিম্ন শ্রেণীর লোককে উত্তোলন করা। এই চারটি ভাব নরেন্দ্রনাথের স্বভাবসিদ্ধ ছিল। ডোমপাড়ার ডোমেদের ভিতর তিনি এইরূপ সংস্কার ও নবভাব দেওয়ার প্রয়াস করিয়াছিলেন। আমাদের খেতা চাকরটিকে এই ভাব দিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং পরে লাটু যে রামদাদার বাড়ীর চাকর ছিল তাহাকেও এই ভাব দিয়াছিলেন। যুবা রাখালরাজের ভিতর নরেন্দ্রনাথ শৈশবেই এই ভাবটি ঢুকাইয়াছিল এবং পরে এই ভাবটি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রচারিত ভাব বলিয়া পরিগণিত হইল। সমস্ত জগতের ভিতর রামকৃষ্ণ মিশন নির্ভীক চিত্তে এই ভাবটি প্রচার করিতেছে অর্থাৎ অবিচলিত ভাবে একের বা সঙ্ঘের নেতৃত্ব মানা, সকলকে

আপনার করিয়া লওয়া, সকলকে সমান অধিকার দেওয়া এবং অনুন্নতদের অভ্যুত্থান করা। এই ভাবটি নরেন্দ্রনাথের শৈশবেই ছিল। সহস্র কণ্ঠে রামকৃষ্ণ মিশন এই ভাবটি প্রচার করিতেছে।

বাল্যকালে অনেক লোক নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা কহিতে আসিত। ভিন্ন ভিন্ন স্বভাবের ও ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তির লোক নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ ও কথাবার্ত্তা কহিতে আসিত। প্রত্যেক লোকের সহিত নরেন্দ্রনাথ ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও ভিন্ন ভিন্ন রূপ লইয়া কথাবার্ত্তা কহিত। যুবা রাখালরাজ নরেন্দ্রনাথের ডানহাত বা ছায়াস্বরূপ থাকায় বহু লোকের সহিত মিশিতে পারিত। কিন্তু বালক স্বভাব ও লাজুক হওয়ায় তখন নরেন্দ্রনাথের মতন মুখফোড় হইয়া সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে পারিত না, কিন্তু মিশিতে জানিত। বহুপ্রকার লোকের সংশ্রবে আসায় সকলেই তাহাকে যত্ন করিত।

—তৃতীয় ভাষণ—

১৬ই কার্ত্তিক ১৩৪৬ সাল। ২রা নভেম্বর ১৯৩৯ খৃঃ।

—ব্রাহ্মসমাজে যাওয়া—

নরেন্দ্রনাথ তখন ব্রাহ্ম সমাজে খুব যাতায়াত করিত। কেশববাবুর সমাজে, সাধারণসমাজে ও আদিসমাজে সর্বদাই যাতায়াত করিত এবং গাহিবার শক্তি থাকায় সর্বত্রই বিশেষ সমাদৃত হইত। সাধারণ সমাজের শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় মাঝে মাঝে আসিয়া আমাকে নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া দিবার কথা বলিতেন। আমি তদ্রূপই করিতাম। এই সময় হইতে যুবা রাখালরাজের ধর্মভাবটা জাগিয়া উঠিল। পূর্বে তাহার ধর্মভাব স্বাভাবিক হইলেও সুষুপ্ত ভাবেই ছিল, কিন্তু এখন হইতে তাহা স্পষ্ট ধারাবাহিকরূপে পরিস্ফুট হইল।

পূর্বে বলা হইয়াছে যে নরেন্দ্রনাথ যখন দর্শনশাস্ত্র ও অন্য কোন বিষয় কথাবার্ত্তা কহিত যুবা রাখালরাজ তাহা নিবিষ্ট মনে শুনিত। এইরূপ নানা কথা সে বিনা অধ্যয়নে শিখিতে লাগিল। যাহা হউক, এই সময় হইতে যুবা রাখালরাজের মন পড়াশুনায় শিথিল হইল এবং অন্য একটা দিকে যাইবে এইরূপ সন্দিহান স্থলে উপনীত হইল। একদিকে আত্মীয় স্বজনের উপরোধ বা আদেশানুযায়ী পড়াশুনা করিতে হইবে এবং সাধারণ লোকের মতন অর্থোপার্জ্জন ও সংসারী হইতে হইবে, অপর দিকে তাহার স্বভাবসিদ্ধ ধ্যানীভাব প্রদীপ্ত হইতে লাগিল। এই সময়টায় তাহার মন দ্বিধাবিভক্ত হইল। একদিকে পড়াশুনায় তেমন মন না থাকায় ডাক্তার প্রতাপ মজুমদারের কাছে হোমিওপ্যাথী শিখিতে যাইল এবং অল্পদিন শিখিয়াই তাহাও তাহার ভাল লাগিল না। কেশববাবুর সমাজ, আদি ও সাধারণ সমাজে যাতায়াত করিত। সে স্বভাবসিদ্ধ সংসার ত্যাগী। ধর্ম জগতে উন্নতি লাভ করিবে কিন্তু আত্মীয় স্বজন ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাকে সাধারণ গৃহীর মতন সংসারী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। বিশেষতঃ সে বিবাহ করিয়াছিল, এইরূপ বিপরীত ভাবের সমাবেশ হওয়ায় তাহার মনকে চঞ্চল করিতে লাগিল। আর পূর্বের মত চাপল্য ভাব রহিল না। অনেকটা যেন নিঝুম ও অন্য পন্থার চিন্তা করিতেছে এরূপ ভাবটা হইল। আমার এখন ৭০ বৎসরের অধিক বয়স। বাল্যকালের সমস্ত ঘটনা চিন্তা করিতে যেমন আনন্দ হইতেছে তেমন শোকও হইতেছে। এজন্য সংক্ষেপে সকল বিবৃত করিতেছি এবং যে সকল উপাখ্যান স্বামী ব্রহ্মানন্দের অনুধ্যান ও অপরাপর গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে এই স্থানে সে সকল বিষয় প্রত্যাখ্যান করা হইল। কেবলমাত্র যুবা রাখালরাজের মনোবৃত্তি ও ক্রমোন্নতি দেখানই উদ্দেশ্য। এই জন্য অপর সকল বিষয় পরিত্যাক্ত হইল।

এই সময় পরমহংস মশায় শিমলায় আসিতে লাগিলেন। রামদাদার বাড়ীতে মাসে একক্ষেপ দুইক্ষেপ আসিতেন এবং মনমোহন মিত্রের বাড়ী ও সুরেশ মিত্রের বাড়ী ও অপর স্থানেও তিনি সর্বদা আসিতেন। অনেক অংশে তিনি শিমলায় ঘরোয়া লোকের মতন হইয়া গিয়াছিলেন। রামদাদার বাড়ীতে পরমহংস মশায় আসিলে আমরা সকলেই দেখিতে যাইতাম এবং কথাবার্ত্তা শুনিতাম। নরেন্দ্রনাথ পূর্ব হইতেই রামদাদার সহিত দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিত, কিন্তু যুবা রাখালরাজ কোন্ সময় হইতে পরমহংস মশায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল তাহা আমার ঠিক স্মরণ নাই। কারণ তখন আমাদের বয়স অল্প, যুবা রাখালরাজের বয়সও অল্প। তাহার বালক বয়স ও লাজুক ভাব, এ জন্য বিশেষ লক্ষ্য করি নাই। যাহা হউক, যুবা রাখালরাজ এই সময় হইতেই পরমহংস মশায়ের সহিত দেখাশুনা ও যাতায়াত করিতে লাগিল ও বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। কারণ একটা বাড়ীর দোতালায় বসিয়া আমরা তিন চার জনে কথা কহিতেছিলাম। কথাটা সাধারণ ভাবে হইতেছিল। প্রসঙ্গক্রমে পরমহংস মশায়ের কথা উঠিল। যুবা রাখালরাজ উপস্থিত কথাবার্তা পরিত্যাগ করিয়া একেবারে মৌন হইল, মুখ অপর প্রকার হইয়া গেল এবং চোখে জল আসিল। প্রচলিত কথাবার্তা বন্ধ হইয়া পরমহংস মশায়ের কথা হইতে লাগিল। দেখিলাম রাখালরাজ পরমহংস মশায়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়াছে ও তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসে। তাহার প্রাণটা যেন একেবারে অন্যদিকে চলিয়া গেল। এই সময় যদিও তাহাকে সাধারণ বালকের ন্যায় গৃহের কার্য ও পড়াশুনা করিতে হইত তবুও সে সর্বদাই অন্যমনস্ক ও আর একটা যেন কি চিন্তা করিত। নরেন্দ্রনাথ অতিশয় দুর্ধর্ষ লোক, শক্তিমান ও চাপল্যে পরিপূর্ণ। তাহাকে বাপ ও কাকার মত উকিল বা ব্যারিষ্টার হইতে হইবে—এই আকাঙ্খা। এই জন্য সে সাধারণ

সমাজে ও পরমহংস মশায়ের কাছে যাতায়াত করিলেও নিজের কেন্দ্র ও অভীষ্ট হইতে বিচ্যুত হয় নাই। কিন্তু যুবা রাখালরাজ যেন কেন্দ্র হইতে বিচ্যুত হইয়া অপরদিকে যাইতে লাগিল। সংসার আর ভাল লাগিল না। এজন্য আত্মীয় স্বজন সকলেই অসন্তুষ্ট হইত এবং অপ্রিয় কথা বলিত। যুবা রাখালরাজ, রামদাদা ও মনমোহনদাদাকে বিশেষ সম্মান করিত, এজন্য ইহারা মাঝে মাঝে একটু কটাক্ষভাবে কথা কহিত, যদিও সকলেই বেশ আদর যত্ন করিত। সে জন্মগত সংসার ত্যাগী ও ধ্যানী; কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থা তাহাকে সংসারে রাখিবার চেষ্টা করিল। এই সময়টা জীবনের একটি কষ্টকর অবস্থা। এইরূপে যুবা রাখালরাজ নিজের বংশগত একটা শক্তি, পরমহংস মশায়ের এক শক্তি ও নরেন্দ্রনাথের শক্তি এই তিন শক্তির আধার হইল এবং ভবিষ্যৎ জীবনে এই তিন শক্তি অতি প্রশস্ত ভাবে বিকাশ করিয়াছিল। এই জন্য তিনি রামকৃষ্ণ মিশনকে সামান্য অঙ্কুর হইতে এত বিশাল মহীরুহ রূপে বিকাশ করিতে পারিয়াছিলেন এবং রামকৃষ্ণমিশনের কার্যপ্রণালী অনুধাবন করিলে এই তিন শক্তির স্রোত বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়।

—চতুর্থ ভাষণ—

১৭ই কার্ত্তিক—১৩৪৬ সাল। ৩রা নভেম্বর ১৯৩৯ খৃঃ।

সেই সময়েতে ধর্মের অর্থ ছিল আহারাদির বিষয় নানারূপ বিধি-নিয়ম পালন করা অর্থাৎ নিরামিষ ভোজন ও স্বপাক রন্ধন। আহারাদি অপরের সহিত করিবে না, অপরকে ছুঁইবে না, সকলেই অশুচি ও নিজে একমাত্র শুচি ব্যক্তি। ধর্ম উপদেষ্টার কাজ হইল কোন শাস্ত্র হইতে পাঠ করিয়া শুনান এবং নিজের ইচ্ছানুযায়ী উদ্ধৃত

অংশের ব্যাখ্যা করা। ইহাকে বলিত আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা। হাতে অনেক সময় মালা জপ করিত কিন্তু এদিকে বিষয় কর্মের কথা হইতেছে এবং জেলেদের কাছে মাছের দর করাও হইতেছে। গৃহস্থালী সমস্ত কর্মই হইতেছে অথচ হাতে মালা জপ করা হইতেছে। সমাজের তখন এরূপ ভাব ছিল। ধর্ম উপদেষ্টার বিশেষ লক্ষ্য ছিল শ্রোতৃবর্গ হইতে কিরূপে কিছু অর্থোপার্জন করা যায়, অন্ততঃ চাল ডালের সিধা, কাপড় চোপড় ও কিছু প্রণামীও উপার্জন করা উদ্দেশ্য। এই হইল তখন ধর্মের অবস্থা। ধর্ম উপদেষ্টাকে তখন শাস্ত্রের ব্যবসায়ী বলিত। ইহা একপ্রকার ব্যবসায়ের অন্তর্গত ছিল। কিন্তু পরমহংস মশায় এক নূতনতর লোক হইলেন। তিনি সম্পূর্ণ অন্য প্রকার লোক। তিনি প্যালাও লইতেন না, সিধাও লইতেন না এবং কোন গ্রন্থ দেখিয়া ব্যাখ্যাও করিতেন না। তিনি প্রত্যক্ষদর্শীর ন্যায় অতি ওজস্বী ভাবে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন এবং কামিনী কাঞ্চন ত্যাগ ও সংসারে বৈরাগ্য এই নূতন ভাবটি প্রচার করিলেন। তাঁহার কথায় সন্দেহ, দ্বিধা বা তর্কযুক্তির বিষয় ছিলনা কিন্তু যেন প্রত্যক্ষদর্শী, নিজে দেখিয়াছেন ও অপরকেও দেখাইতে পারেন এরূপ তেজপূর্ণ কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। একটা জীবন্ত শক্তি, একটা জীবন্ত ভাব ও নূতন প্রকার ভাব তাঁহার কথাবার্তা হইতে বাহির হইত। সমাধি ও নিস্পন্দ হইয়া যাওয়া, রক্ত সঞ্চালন বন্ধ হইয়া যাওয়া এক নূতন জিনিস তিনি দেখাইলেন। ইহা দেখিয়া অনেকে আশ্চর্য হইয়াছিলেন। এই কথা লইয়া ডাক্তারদের ভিতর বিশেষ আন্দোলন হইয়াছিল। জীবন্ত ব্যক্তি মৃত হইল, পুনরায় মৃত ব্যক্তি জীবন্ত হইল। এই জন্য অল্প সংখ্যক যুবকদের ভিতর তাঁহার প্রতি একটা শ্রদ্ধা ভক্তি আসিল। এজন্য বৃদ্ধরা ও শাস্ত্রব্যবসায়ীরা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইল অর্থাৎ তাঁহাকে পছন্দ করিত না। কিন্তু কয়েকটি যুবক তাঁহার এই ওজস্বীতাপূর্ণ কথাবার্তায় আকৃষ্ট হইয়া নিতান্ত

অনুগত হইল এবং সাধন ভজন যে ধর্ম জীবনের প্রধান অঙ্গ এবং এইটি জীবনে উপলব্ধি করিতে হয়, এইটি তাহাদের ভিতর প্রথম উদ্ভূত হইল। ঈশ্বর অনুভূতি যে জীবন্ত শক্তি এবং জীবনে তাহা প্রতিফলিত করিতে হয়—এই ভাবটি কয়েকটি যুবকের ভিতর প্রবুদ্ধ হইল। যুবা রাখালরাজ, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির ভিতর সুষুপ্ত শক্তি যেন প্রদীপ্ত হইল এবং পরমহংস মশায়ের কথা ও তাঁহার জীবনের সাধনা নিজেদের জীবনে উপলব্ধি করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা হইল। ঠিক যেন পূর্বজন্মের সুষুপ্ত শক্তি হঠাৎ একটা অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পাওয়ায় প্রজ্জ্বলিত ও প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। এইরূপে রাখালরাজ পড়াশুনা একপ্রকার ত্যাগ করিল। গৃহাশ্রমের প্রতি তাহার মনোভাব একেবারে শিথিল হইয়া গেল এবং অন্য আশ্রম, অন্য জীবন ও অন্য জগতে চলিয়া যাইবে এই ভাবটা তাহার প্রবল হইল। ধর্ম জগতে সে যে এত উচ্চ অবস্থা লাভ করিবে সেইটি যেন তাহার পূর্ব-জন্ম সঞ্চিত সংস্কার। পরমহংস মশায়ের সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় পূর্ব সঞ্চিত সংস্কার সকল প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সংসার তাহার আর ভাল লাগিত না। চাপল্য ভাব কমিয়া গেল। একেবারে সে নিঝুম অনির্দ্দিষ্ট চিন্তায় মগ্ন এবং শান্ত প্রকৃতির বালক হইল। এই সময় তাহার এরূপ মনোভাব হওয়ায় পূর্ব সঙ্গীরা তাহাকে নির্বোধ বালক বলিত এবং একটু আধটু ঠাট্টাও করিত; ঠিক যেন নদীর এক কিনারা হইতে সন্তরণ করিয়া অপর কিনারায় যাইবার প্রয়াস করিতে লাগিল। এই সময় তাহার মন দ্বিধা বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল এবং সেজন্য আত্মীয় স্বজনের কাছে একটু অপ্রিয় কথা শুনিতে হইয়াছিল। বিবাহ করিয়াছে, সংসারের কোন কাজে মন নাই, কেবল দক্ষিণেশ্বরের পরমহংস মশায়ের সহিত মিশিবে ও তাঁহার কাছে যাইবে—এই প্রকার নানা অপ্রিয় কথা হইত। কিন্তু যুবা রাখালরাজ স্থির ভাবে তাহার পন্থা অবলম্বন করিয়া

লইল অর্থাৎ ইহাই তাহার স্বভাবসিদ্ধ ভাব, কেবলমাত্র উপাদান ও উপকরণ পাইতেই গতি অন্যদিকে প্রধাবিত হইল।

পূর্বে বলা হইয়াছে পরমহংস মশায় সর্বদাই রামদাদার বাড়ীতে আসিতেন এবং ক্রমে ক্রমে দশ পনর জন লোক হইতে লোক সংখ্যা বাড়িতে লাগিল এবং একটু উৎসব মতনও হইত। যুবা রাখালরাজ অতি লাজুক ও বিনয়ী ছিল। পরমহংস মশায় রামদাদার বাড়ীতে আসিলে কোন্ সময় সে যাইত তাহা আমার ঠিক স্মরণ নাই। ইহা আমি বিশেষ লক্ষ্যও করি নাই। কারণ বাড়ীর ছেলে নিমন্ত্রণ করাও ছিল না এবং আহ্বানও ছিলনা। মাঘোৎসবের কয়েকদিন পূর্বে পাড়ার নন্দ চৌধুরীর বাড়ীতে এক সভা হয়। কেশববাবু ও পরমহংস মশায়ের আসিবার কথা ছিল। তখন কেশববাবুর শিমলাতে বড় প্রভাব। তিনি মনমোহনদা'র বাড়ীতে একবার আসিয়া ধর্মোপদেশ দিয়াছিলেন। যাহা হউক, যুবা রাখালরাজ ও আমি বিকালে নন্দ চৌধুরীর বাড়ীতে যাইলাম। উঠানে সকলে বসিয়া ভজন গাহিতেছিলেন। সঙ্গীতটি হইল—

"মন একবার হরিবল হরিবল হরিবল
জলে হরি স্থলে হরি অনলে অনিলে হরি……
……ইত্যাদি।

আমরা দুই জনে উঠানে গিয়া বসিলাম। ভজন সমাপ্ত হইলে ঠাকুরদালান হইতে পণ্ডিত গৌরগোবিন্দ রায় ভাগবত ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। এদিকে সন্ধ্যা হইল। নরেন্দ্রনাথ সন্ধ্যার সময় উপস্থিত হইল। পড়িবার সময় হইয়াছে বলিয়া আমি চলিয়া আসিলাম। রাখালরাজ বসিয়াছিল। পরে পরমহংস মশায় ও কেশববাবু আসিয়াছিলেন। আমি তখন উপস্থিত ছিলাম না। এইরূপে রাখালরাজ পরমহংস মশায়ের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইল। তখনও

তাহার মন দ্বিধা বিভক্ত; স্থির করিতে পারিতেছিল না যে কোন্ পন্থা অবলম্বন করিবে।

বিশেষ করিয়া পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে নরেন্দ্রনাথ ও যুবা রাখাল একমন একপ্রাণ; কেবলমাত্র ভিন্ন দেহ ছিল। ঠিক যেন পূর্বজন্মে দুই জন পরম বন্ধু ছিল। এই জন্মে ভিন্ন ভিন্ন বংশে জন্মিয়াছিল। কিন্তু অল্প দিন পরেই দুই জনে এক হইয়া যাইল। রাখালরাজ সর্ব বিষয়ে নরেন্দ্রনাথের ডানহাত স্বরূপ ছিল।

পরমহংস মশায় যখন রামদাদার বাড়ীতে আসিতেন তখন যুবা শশী অর্থাৎ শশীভূষণ চক্রবর্তী নামে একটি বালক প্রত্যেক বারেই আসিত। তখন সে স্কুলে পড়িত, বয়স অল্প। সে পরমহংস মশায়ের তাকিয়ার ডানদিকে বসিত এবং যেখানে ডানহাতের কাছে কাচের গ্লাসে জল থাকিত সেখানে সে বসিত। সেটা তার নির্দ্দিষ্ট স্থান ছিল। একমনে কান খাড়া করিয়া পরমহংস মশায়ের সকল কথা শুনিত। পরমহংস মশায়ের সমাধিস্থ অবস্থা হইতে মন যখন দেহেতে নামিয়া আসিত তখন সে কাচের গ্লাসের জলটা পরমহংস মশায়ের হাতে আগাইয়া দিত। কিন্তু তখন আমাদের সহিত বিশেষ আলাপ পরিচয় হয় নাই। সে পরে একটি কথা বলিয়া বড় আক্ষেপ করিত যে জলের গ্লাসে একবার তার পা ঠেকিয়া গিয়াছিল। পরমহংস মশায় যখন সমাধি হইতে নামিয়া জল খাইবার জন্য হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন তখন জলটা বদলাইয়া দিবার সময় ছিল না। সে জন্য সেই জলটা তাঁহাকে পান করিতে দিয়াছিল। এ জন্য তাহার মনে একটা বড় আক্ষেপ ছিল। এ কথাটা সে পরে কয়েকবার বলিয়াছিল।

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত তখন নূতন মাষ্টার হইয়াছেন। তিনি পরমহংস মশায়ের তাকিয়ার বাম দিকে বসিতেন অর্থাৎ তাকিয়া ও দেয়ালের দিকে কাচের দরজাওয়ালা তাকটির কাছে তিনি বসিতেন। যার

যার বসিবার স্থান নির্দিষ্ট ছিল। দেবেন মজুমদার মহাশয় দ্বিতীয় ও তৃতীয় দরজার মাঝখানের দেওয়ালটিতে বসিতেন। যাহা হউক এইরূপে একটি গোষ্ঠী হইতে লাগিল।

নরেন্দ্রনাথ তখন কলেজে পড়ে। সেই সময় বলরামবাবু মাঝে মাঝে শিমলাতে আসিতে লাগিলেন। তিনি অতিশয় বিনয়ী, নম্র ও মিষ্টভাষী ছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে প্রাতঃকালে নরেন্দ্রনাথের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিতেন। বলরামবাবুর বাড়ীতে রামদয়াল চক্রবর্তী থাকিতেন। তাঁহাকে আমরা দয়ালবাবু বলিতাম। তিনিও মাঝে মাঝে আসিতেন। মাষ্টার মশায়ও মাঝে মাঝে আসিতেন। দেবেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় তখন গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুরদের বাড়ীর জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিতেন। তিনি মামলা মোকদ্দমা হিসাবে আমার ছোটকাকার কাছে যাইতেন। কারণ ছোটকাকা তারকনাথ দত্ত ঠাকুর বাড়ীর উকিল ছিলেন। এ জন্য দেবেনবাবুর সহিত বাল্যকাল হইতেই আমাদের আলাপ পরিচয় ছিল। কিন্তু পরমহংস মশায়ের সংস্পর্শে আসায় নরেন্দ্রনাথের কাছে অন্যভাবে আসিতে লাগিলেন। যুবা রাখালকে এইরূপে সকলের সহিত মিশিতে হইত ও নানা প্রকার কথাবার্তা চলিত। ব্রাহ্ম সমাজেরও অনেক ব্যক্তি আসিতেন। এইরূপে একটি ক্ষুদ্র আয়তনে রামকৃষ্ণ গোষ্ঠী বা সঙ্ঘ অজ্ঞাতসারে সৃষ্ট হইল এবং নরেন্দ্রনাথের এই সময়ে যে সকল ভাব ছিল তাহা সে সকলকে বুঝাইবার চেষ্টা করিত। পরে এই সামান্য গোষ্ঠীটি বিশাল রামকৃষ্ণ মিশনে পরিণত হইল এবং সেই সময়কার সকলভাব রামকৃষ্ণমিশন জগতে প্রচার করিতেছে। অর্থাৎ এই সামান্য গোষ্ঠীটি ভবিষ্যতের রামকৃষ্ণ মিশনের বীজ বা অঙ্কুর বলা যায়।

—পঞ্চম ভাষণ—

১৮ই কার্ত্তিক, ১৩৪৬ সাল। ৪ঠা নভেম্বর, ১৯৩৯ খৃঃ।

রাখালের দক্ষিণেশ্বরে গিয়া থাকা।

বাগবাজারে বলরামবাবুর বাড়ীতে পরমহংসমশায় আসিতেন এবং গিরীশবাবুর বাড়ীতে মাঝে মাঝে যাইতেন। অনেক লোক সমাগম হইত এবং অল্প পরিমাণে উৎসবাদিও হইত। কিন্তু আমি সে সময় উপস্থিত না থাকায় সে বিষয় বিশেষ কিছু বলিলাম না। শিমলার-বিষয় অর্থাৎ রামদাদার বাড়ী ও অপর সকলের বাড়ীতে পরমহংস-মশায় যখন যাইতেন তখন আমি অনেক সময় উপস্থিত থাকিতাম। এ জন্য শিমলার কথা বলিতেছি। ক্রমে রাখালরাজ শিমলা ত্যাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়া থাকিতে লাগিল। এ সকল বিষয় পুঙ্খানু-পুঙ্খ ভাবে আমার স্মরণ নাই বা তখন এত বিশেষ করিয়া মনোযোগ করি নাই। কারণ নরেন্দ্রনাথের তখন প্রাধান্য। এজন্য প্রত্যেক ঘটনায় মনোযোগ না করায় এখন স্মরণ নাই। পরমহংসমশায় ভাবাবেশে দেখেন যে একটি শিশু সন্তান তাঁহার কোলে আসিল এবং যুবা রাখালরাজের পরমহংসমশায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে ক্রোড়স্থ শিশুসন্তান বলিয়া চিনিতে পারিলেন। তদবধি রাখাল-রাজকে পরমহংসমশায়ের মানস-পুত্র বলিয়া সকলেই গ্রহণ করিল ও বিশেষ যত্ন করিত। এই সময় তাহার জপ করিবার ভাবটা প্রবল হইল। আমার বিশিষ্ট লোকের কাছে শোনা কথা যে সে দক্ষিণেশ্বরে অনবরত জপ করিত। বাহিরে কোন চিহ্ন নাই অথচ অনবরত ঠোঁট নড়িতেছে। এই সময় রাখালরাজ একেবারে নরম, বিনয়ী ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ভাবে পরিপূর্ণ হইল। কখনও বা শিমলায় থাকিত কখনও বা দক্ষিণেশ্বরে থাকিত। প্রত্যেক দিনের ঘটনা আমার বিশেষ

করিয়া স্মরণ নাই কিন্তু শিমলায় আসিলে দেখিতাম যে আগেকার চাপল্যপূর্ণ ভাব আর নাই, যেন অন্য এক পথের লোক হইয়াছে। তদবধি সকলে যুবা রাখালরাজকে একটু বিশেষ শ্রদ্ধার চোখে দেখিতে লাগিল। তাহার আত্মীয় স্বজনের মনে যাহাই থাকুক না কেন তাঁহারা বিশেষ আদর ও সম্মান করিয়া কথা কহিতেন। ক্রমে রাখালরাজ একেবারে দক্ষিণেশ্বরে গিয়া থাকিতে লাগিল। কখন কখনও বা শিমলায় আসিত। আগে নরেন্দ্রনাথের সঙ্গী বা ছায়া স্বরূপ ছিল। এখন হইতে পরমহংসমশায়ের নিতান্ত অনুগত, ভক্ত, সেবক ও হাতের ছড়িস্বরূপ হইল। লাটুও রামদাদার বাড়ী ত্যাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়া থাকিতে লাগিল। যুবা রাখালরাজ পরমহংসমশায়ের সহিত একবার সিঁথির বাগানে গিয়াছিল। আর একবার কামারহাটির গোপালের মা যে বাগানে থাকিতেন পরমহংস-মশায়ের সহিত সে বাগানে গিয়াছিল এবং কাঁসারি পাড়ায় এক হরিসভায় পরমহংসমশায়ের সহিত সেও আসিয়াছিল। সে সকল কথা অপর গ্রন্থে বিশেষ বর্ণিত হওয়ায় এ স্থলে বিশেষ উল্লেখ করা হইল না। সংক্ষেপে কিছু বলা হইল যে পরমহংসমশায় যেখানে যাইতেন যুবা রাখালরাজও তাঁহার সহিত সেই স্থানে যাইত। কারণ ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আমার স্মরণ নাই। তবে অনেক কথা আমি বিশ্বস্ত ও শ্রদ্ধেয় ব্যক্তির কাছে শুনিয়াছি এবং অনেক গ্রন্থেও প্রদত্ত হইয়াছে। এজন্য বাহুল্যবশতঃ আমি ঐ সকল অংশ পরিত্যাগ করিলাম।

পরমহংসমশায়ের শরীর অসুস্থ হইলে চিকিৎসার জন্য শ্যাম-পুকুরের এক বাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহাকে আনা হয়। এই শ্যাম-পুকুরে অবস্থানকালে যুবা রাখালরাজের ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সকলকে খাওয়াইয়াছিল। দিনটা রবিবার। প্রচণ্ড রৌদ্র। কোন্ মাস আমার এখন মনে নাই। তখন আমরা রামতনু বোসের গলির বাড়ীতে থাকিতাম। নরেন্দ্রনাথ যুবা রাখালরাজের ছেলের ভাতে

খাইতে যাইবে আমাকে এই কথা বলিয়া সকালে চলিয়া যাইল। এইটি হইল নরেন্দ্রনাথের জীবনের এক বিশেষ দিন। কারণ এই দিন হইতেই নরেন্দ্রনাথ একপ্রকার গৃহত্যাগী হইল। বাড়ীতে আর বড় আসিত না। তবে মাঝে মাঝে আবশ্যক হইলে আসিত। বছরটা ১৮৮৫ খৃঃ হওয়াই সম্ভব। এইরূপে যুবা রাখালরাজও গৃহত্যাগ করিল এবং পরমহংসমশাই-এর কাছে থাকিতে লাগিল।

এস্থলে একটা বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে যুবা রাখালরাজ বিভবশালী ব্যক্তির পুত্র। বাপের যথেষ্ট সম্পত্তি ছিল। বাড়ীতেও অনেক লোক আহার করিত। বয়স তরুণ, স্ত্রী ও পুত্র রহিয়াছে। কিন্তু সংসারের সমস্ত মায়া, সুখ ভোগ ইচ্ছা, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য সকলই পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের জন্য, ধর্ম লাভের জন্য সংসার-সুখ বিসর্জন দিয়া কঠোর সন্ন্যাস পথ অবলম্বন করিল। স্ত্রী এদিকে শোক করিতেছে, নূতন শিশু হইয়াছে তাহারও মমতা আছে; সমাজে তাহার একটা বিশেষ-স্থান আছে। আত্মীয় স্বজনেরও মমতা রহিয়াছে কিন্তু সমস্ত মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া একেবারে সাধুর জীবন গ্রহণ করিল। তাহার এরূপ কঠোর মনোভাব, প্রবল বৈরাগ্যভাব, ধর্ম উপার্জনের জন্য সর্বত্যাগ করা এবং অনিশ্চিত পন্থায় চলিয়া যাওয়া—এ সকল বিষয় বর্ণনা করিবার নয় কিন্তু বিশেষভাবে চিন্তা করিবার বিষয়।

প্রাচীন গ্রন্থে ভগবান বুদ্ধের সংসার ত্যাগ বিষয়ে এরূপ উল্লেখ আছে যে তিনিও স্ত্রী-পুত্র ও অতুল বৈভব ত্যাগ করিয়া সাধু হইয়াছিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থে মহাপ্রভু সনাতনের এবং দাস রঘুনাথ (যিনি মহাপ্রভু চৈতন্যের বিশেষ সেবক ছিলেন) তাঁহারও উল্লেখ আছে। এ সকল বিষয় আমি গ্রন্থে পাঠ করিয়াছি। কিন্তু যুবা রাখালরাজের গৃহত্যাগের বিষয় আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহার জীবনের এই ঘটনা বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয় এবং পূর্বতন

মহাপুরুষদিগের সহিত তাহাকে সম্পূর্ণরূপে তুলনা করা যাইতে পারে। পরমহংসমশাই-এর কি অদ্ভুত শক্তি যে নরেন্দ্রনাথ, যুবা রাখালরাজ, যুবা শশী, যুবা শরৎচন্দ্র ও আরও কয়েকটি যুবককে জীবনের বাঞ্ছিত উদ্দেশ্য পরিত্যাগ করাইয়া অপর পথে লইয়া যাইলেন এবং ইঁহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ পন্থানুযায়ী জগতে কৃতিত্ব ও মহত্ব দর্শাইয়া গিয়াছেন। জগতের ইতিহাসে এই গোষ্ঠীর বিষয় এক নূতন পর্যায় বলিয়া পরিগণিত হইবে। প্রত্যেকেই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং নিঃস্বার্থ কর্মী, ঈশ্বরপরায়ণ ও আদর্শ পুরুষ হইয়া জগতে এক নূতন পন্থা দেখাইয়াছেন, জগতে এক নূতন ভাব-ধারা, নূতন কার্য প্রণালী, নূতন আদর্শ দেখাইয়াছেন। এজন্য এই ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর সকলকে প্রণাম করি ও সকলে যেন প্রণাম করেন। কারণ এই কয়েকটি মহাপুরুষের কার্য ও চিন্তা স্রোত দেশের ভাবধারা পরিবর্তন করিবে। পূর্বতন মহাপুরুষ সকল যেন নবদেহ ধারণ করিয়া এই কালে এই সকল মহাপুরুষরূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সকলকেই প্রণাম করি।

—ষষ্ঠ ভাষণ—

২৬শে কার্তিক, ১৩৪৬ সাল। ১২ই নভেম্বর, ১৯৩৯ খৃঃ।

তাপস ভাব

—শ্যামপুকুরের বাড়ীর কথা—

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে পরমহংসমশাই-এর শরীর অসুস্থ হইয়া পড়িল। চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে শ্যামপুকুরের একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া আনা হইল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে যুবা রাখালরাজ শিমলা ত্যাগ করিয়া অনেক সময় দক্ষিণেশ্বরে বাস করিত। এই শ্যামপুকুরের বাড়ীতে নরেন্দ্রনাথ ও যুবা রাখালরাজ পরমহংসমশাই-এর কাছে

সেবকরূপে থাকিতে লাগিল। সেইসময়ে রামদাদা সর্ব বিষয়েই প্রধান ছিলেন এবং সুরেশ মিত্তির রামদাদার সহকর্মীরূপে সর্ব বিষয়েই দেখাশুনা করিতেন। এতদ্ব্যতীত গিরীশবাবু, বলরামবাবু, অতুলবাবু ও আরও সকলে তত্ত্বাবধান করিতেন। যাহা হউক, ক্রমে অল্প পরিমাণে একটি রামকৃষ্ণ গোষ্ঠী হইবার সূচনা হইল। তখন ইহা সামান্যভাবে হইয়াছিল। আমি প্রত্যহই সকলের কাছে এই সকল কথা শুনিতাম এজন্য অনেক বিষয় স্মরণ আছে। এই সকল বিষয় অপর গ্রন্থে প্রদত্ত আছে এজন্য এস্থলে সংক্ষেপে বর্ণনা করিতেছি।

এখন আমার বয়স অধিক হইয়াছে, যাইবার সময়, এইজন্য সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিয়া যাইতেছি এবং কয়েকটি কথা যাহা পূর্বে প্রদত্ত হয় নাই তাহাও এস্থলে লিপিবদ্ধ করিতেছি।

মাষ্টারমশায় এইসময় কয়েক বৎসর অধ্যাপনার কাজ করিতে-ছিলেন; নরেন্দ্রনাথের সংসারে তখন বড় কষ্ট যাইতেছিল। বাবা হঠাৎ গত হওয়ায় সংসারে অতিশয় কষ্ট হইল। নরেন্দ্রনাথ তখন কোন কাজকর্ম বা রোজগার করিতে পারে নাই এজন্য সংসারে বিশেষ কষ্ট হইয়াছিল। মাষ্টারমশায় এইসকল কথা জানিয়া নরেন্দ্র-নাথকে সংসার খরচের জন্য একশত টাকা দিয়াছিলেন। এইজন্য মাষ্টারমশায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। এতদ্ব্যতীত তিনি আরও অনেক উপকার করিয়াছিলেন। এই প্রত্যেক কার্যের জন্য তাঁহার প্রতি সম্মান জানাইতেছি ও শতবার প্রণাম করি।

একটি বিশেষ কথা এস্থলে উল্লেখ করিবার বিষয় যে রামকৃষ্ণের আবির্ভাবে নূতন একটা জিনিস সমাজের ভিতর দেখা যাইল। এইটিতেই সকলে বিশেষ মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছিল। নিঃস্বার্থ ভালবাসা কি—সমাজে এইটি তিনি নূতন দেখাইলেন। কলিকাতার সমাজটা তখন মহাস্বার্থপর ও হিংসাদ্বেষে পরিপূর্ণ ছিল। পরকে

ঠকাইয়া লওয়া, নিজের স্বার্থসিদ্ধি করা এইরূপ হিংসাদ্বেষের ভাবটা সমাজে তখন অতিশয় প্রবল কিন্তু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসার দরুণ অতি অল্প সংখ্যক লোকের ভিতর নিঃস্বার্থ ভালবাসা, সকলকে আপনার করিয়া লওয়া, সকলকে সমান অধিকার দেওয়া, জাতাজাতি, উঁচু, নীচু এইসকল জ্ঞান ত্যাগ করিয়া সকলেই এক গোষ্ঠীর লোক, প্রত্যেকের একই উদ্দেশ্য, একমন একপ্রাণ এইসকল ভাব নূতন আসিল। দেহটা শুধু ভিন্ন। এইটিকেই দেবশক্তি বা ঐশ্বরিক শক্তি বলা যায়। এইটি হইল রামকৃষ্ণ-সংঘের বিকাশ। এই ভালবাসার সূচনাই রামকৃষ্ণ সংঘকে কেন্দ্রীভূত করিয়া রাখিবার উপক্রম করিল। যুবা রাখালরাজের তখন বয়স অল্প ছিল ও সে অতিশয় লাজুক ছিল এবং সকলের অনিচ্ছায় স্ত্রী-পুত্র ত্যাগ করিয়া অন্য-পথে যাইতেছিল এজন্য তাহার আত্মীয়েরা অল্পবিস্তর বিরক্ত ছিল। কিন্তু যুবা রাখালরাজ সকলের গঞ্জনা নির্বাক হইয়া সহ্য করিতে লাগিল। যাহা হউক, শ্যামপুকুরের বাড়ী হইতে কাশীপুরের বাগানে পরমহংসমশাইকে লইয়া যাওয়া হইল। এই সময় রামকৃষ্ণ গোষ্ঠী একটু ঘনীভূত হইয়া উঠিল। এদিকে যেমন বয়োজ্যেষ্ঠদের দল সমষ্টিভূত হইল অপরদিকে যুবকদের দল আর একটি সমসূত্রে গঠিত হইল। একটি হইল গৃহীদের দল অর্থাৎ যাঁহারা সংসারেও থাকিবেন ও পরমহংসমশাইকে শ্রদ্ধা-ভক্তিও করিবেন। অপর দলটি হইল যাঁহারা সংসার ত্যাগ করিয়া সাধন-ভজন করিবেন। যদিও উভয় দলের ভিতর কার্যতঃ কোন পার্থক্য ছিল না কিন্তু দুই পন্থীদের ভিতর দুই রকমের ভাব ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল। একদিকে যেমন রামদাদা, সুরেশ মিত্তির, গিরীশ ঘোষ, অতুল ঘোষ. বলরাম-বাবু ইত্যাদি সর্ব বিষয়ে দেখাশুনা করিতেন; অপরদিকে নরেন্দ্রনাথ, যুবা রাখালরাজ, যুবা শশী, যুবা শরৎ, তারকনাথ, যুবা কালী, লাটু, গঙ্গাধর প্রভৃতি সকলেই আর একটি গোষ্ঠী করিল। একদল হইল

মহাভক্তিমার্গী এবং অপর দল হইল সাধন মার্গী। এই যুবা গোষ্ঠী কেবল সাধন-ভজন করিবে, এইরূপ মনস্থ করিল এবং নরেন্দ্রনাথ এই নব দলের নেতাস্বরূপ হইল।

একটি বিশেষ কথা উল্লেখযোগ্য যে এই সময়ে লাটুর অভ্যুত্থান হয়। পূর্বে লাটু রামদাদার বাড়ীর চাকর ছিল কিন্তু রামদাদার নির্দেশ অনুসারে সে দক্ষিণেশ্বরে যাইয়া পরমহংসমশাই-এর সেবা শুশ্রূষা করিবে এরূপ আদেশ হইল। কিন্তু কয়েক বৎসর পরমহংসমশাই-এর কাছে থাকায় ও অনবরত জপ করায় লাটু পূর্বভাব সমস্ত ত্যাগ করিয়া সাধুর জীবন অবলম্বন করিল। আমি কাশীপুর বাগানে লাটুকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম। লাটুর বর্ণ উজ্জ্বল হইয়াছে, আর মলিন নাই, বুকে জোর আসিয়াছে, চক্ষুর দৃষ্টি স্থির ও শান্ত, কথাবার্তা গম্ভীর ও স্নেহপূর্ণ। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির পাশে বসিয়া রহিয়াছে ও সকলকে নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। আমাকেও নাম ধরিয়া ডাকিল ও কথাবার্তা কহিতে লাগিল। এ যেন শিমলার লাটু আর নয়, ঋষি-কুমার হইয়াছে। কেবল রামদাদা ও সুরেশ মিত্তিরকে দেখিলে কিঞ্চিৎ সঙ্কোচ করিয়া কথা কহিত এতদ্ব্যতীত সকলের সহিত সমান ভাবে কথা বলিত।

পূর্বেই বলিয়াছি যে শৈশবে নরেন্দ্রনাথের ভাব ছিল, কেন্দ্রের বা সংঘের অনুগত হইয়া থাকা, নিঃস্বার্থ কর্মী হওয়া, সকলকে আপনার করিয়া লওয়া ও সকলকে সমান অধিকার দেওয়া। সেই ভাবটি কাশী-পুরের বাগানে ধীরে ধীরে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। কারণ এই ভাবটি তখনকার দিনে অতিশয় অভিনব। প্রত্যেক যুবকটিই ভিন্ন-ভিন্ন বংশে জন্মিয়াছে, ভিন্নশ্রেণী ও সমাজ হিসাবে নানারূপ পার্থক্য ছিল। কিন্তু ভালবাসা, অকপট-প্রেম কিরূপ জীবন্ত শক্তি ও প্রত্যক্ষ বস্তু, তাহা এই কাশীপুর বাগানে সকলেই বেশ অনুভব করিতে লাগিল। তখনকার দিনে এই বাংলাদেশে এইটি নূতন আবির্ভূত

হইল। জাতি, বংশ, কুল, উচ্চ, নীচ সমস্ত ভুলিয়া যাইয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একটি জ্বলন্ত ও জীবন্ত প্রেমপূর্ণ অল্পপরিসর একটি গোষ্ঠী হইল। ইহা কেবল কথা বলিবার বিষয় নয়, বিশেষ করিয়া চিন্তা করিবার বস্তু। কারণ এইটি হইল রামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম ভিত্তি এবং এই অকপট ভালবাসাই রামকৃষ্ণ সংঘ জগতে বিকাশ করিতেছে। তখন যাঁহারা এই সংঘের সংশ্রবে আসিয়াছিলেন তাঁহারা সকলেই এক বাক্যে ইহা স্বীকার করিবেন। ইহা ছিল ভালবাসার জন্যই ভালবাসা। এই সময়ের কথা অন্য অনেক গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে। এজন্য এস্থলে সংক্ষেপে বলিলাম। অপরদিকে যুবা রাখালরাজ অনবরত জপ করিতে লাগিল এবং সকলেই যে পরে সংসার আশ্রম ত্যাগ করিয়া সাধনমার্গে যাইবে তাহা সকলেই একরূপ মনস্থ করিল। আর একটি কথা, ভক্তি, কীর্তন ও সামান্য ভাবে ধর্মগ্রন্থ পাঠ এই সকলই হইল ধর্মজীবন, কিন্তু সাধন-ভজন ও তপস্যা বলিয়া যে জগতে একটা জিনিস আছে তাহা বিশেষ প্রচলন ছিল না। যাঁহারা কিছুমাত্র সাধন ভজন করিয়াছিলেন তাঁহারা ব্যক্তিগত ভাবে তন্ত্রের বা বৈষ্ণব শাস্ত্রের সাধন করিয়াছিলেন। কিন্তু সংসার ত্যাগ করিয়া, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া সমষ্টি ভাবে সাধন ভজন করা ও তাহাতে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করা এইটি কাশীপুর বাগানে দেখা গিয়াছিল। পূর্বতন পন্থা নূতন ভাবে হইল। এমন কি যাঁহারা বয়োজ্যেষ্ঠ ছিলেন তাঁহারও গৃহত্যাগ বিষয়ে একটু অসন্তোষভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আর একটি কথা যুবা রাখালরাজের স্ত্রীপুত্র, বাপের বিষয় সম্পত্তি কিছু ছিল। নরেন্দ্রনাথের সংসারে তখন দারুণ কষ্ট; যুবা শশী ও যুবা শরতের সংসারেও বড় কষ্ট। বাপ মা প্রতীক্ষা করিয়াছিল তাহারা উপার্জন করিয়া সংসারের দুঃখ মোচন করিবে। প্রত্যেকেরই আত্মীয় স্বজন এরূপ আশা ও প্রতীক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু পরমহংসমশাই-এর এরূপ আশ্চর্য শক্তি যে প্রত্যেক যুবকের সংসারের কষ্ট ও বিপন্নভাব

থাকা সত্ত্বেও এক প্রবল ঝটিকা ঝঞ্ঝা আসিয়া সকলকে যেন সংসার হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইল এবং কয়েকটিকে নির্বাচিত করিয়া সাধন মার্গের জন্য নিয়োজিত করিল। এসকল চিন্তা করিবার বিষয়। এই সময় রাখালরাজের আভ্যন্তরীণ মনে বিশেষ কষ্ট ও দৃঢ়তা প্রকাশ পাইতে লাগিল। নবজাত শিশু-সন্তানকে পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া সে অপর পন্থায় চলিল। যুবা নিরঞ্জন চাপল্য বশতঃ কখন কখন রাখালরাজকে ঠাট্টা করিত যে তাহার স্ত্রীর জন্য মনটা চঞ্চল হয় ও এজন্য সে বিষণ্ণ হইয়া থাকে। কিন্তু রাখালরাজ সে সকল কথায় কর্ণপাত না করিয়া একমনে নিবিষ্ট চিত্তে জপ করিত; কেবল তাহার ঠোঁটটি নড়িত। শিমলায় অবস্থান কালে তাহার যেমন বালকোচিত চাপল্যভাব ছিল সে সকল ভাব একেবারে বিদূরিত হইল। আর শিমলার রাখাল রহিল না। এখন যেন তাপস রাখালরাজ হইতে লাগিল।

অপর একটি কথা, সকালবেলা নরেন্দ্রনাথ নানা শাস্ত্র লইয়া পাঠ করিত। সেই সময় বেদান্ত শাস্ত্র বাংলাদেশে নূতন বস্তু; কারণ সে সময় ভক্তিমার্গের প্রচলন ছিল। ভাগবত ও বাইবেল পাঠ এই দুইটি হইল প্রধান। এতদ্ব্যতীত অপর যে সমস্ত ধর্মগ্রন্থ ছিল তাহা সকলেরই অবিদিত। নরেন্দ্রনাথ এই সময় বেদান্ত, উপনিষদ ইত্যাদি নানা গ্রন্থ আনাইয়া পাঠ করিতে লাগিল এবং সকলে সমবেত হইয়া শুনিতে লাগিল। এইরূপে সকলে মুখে মুখে বেদান্ত প্রভৃতি শিখিয়া লইল। লাটুও বেশ শাস্ত্র শিখিল। তাহার স্বাভাবিক তর্ক যুক্তির শক্তিটা ছিল কিন্তু ভাষা তাহার অন্য প্রকার। এইরূপ নানা শাস্ত্র সে কান পাতিয়া শুনিয়া শাস্ত্রের অনেক বিষয় সে শিখিয়াছিল। এস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে রাখালরাজ যদিও বাল্যকালে অর্থাৎ শিমলায় অবস্থানকালে পড়াশুনায় বিশেষ মনোযোগ করে নাই কিন্তু তাহার মেধা প্রখর ছিল। সে শাস্ত্রপাঠকালে ধ্যানমগ্ন হইয়া সকল বিষয় শুনিত ও উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিত। এইরূপে নিজের জীবনে

সেই সকল ভাব উপলব্ধি করায় রাখালরাজ এত উচ্চে উঠিতে পারিয়াছিল। আর একটি দেখিলাম যে তাহার ভিতর শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা ভাবটা প্রবল ছিল। কোন বিশিষ্ট লোক তাহাকে যখন যে কথা বলিতেন রাখালরাজ তাহা নিষ্ঠা সহকারে শুনিয়া লইত ও কার্যে পরিণত করিতে চেষ্টা করিত। অশ্রদ্ধা ও অবজ্ঞার ভাব তাহার ছিল না। এজন্য সে সকলের এত শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিল এবং পরিশেষে লোকরঞ্জন হয়। এই সময় হইতে পূর্ব রাখালরাজ চলিয়া যাইয়া তাপস রাখাল হইল। কোমল, বিনয়ী, নম্র, সম্পূর্ণ নির্বাক-পুরুষ, সকলের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তিপূর্ণ এবং ঈশ্বরানুরাগ ও উপলব্ধি ভাবটা তাহার ভিতর যেন হুতাশনের মত প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। সকলেই যেন তাহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ও স্নেহপূর্ণ ভাবে দেখিতে লাগিল। এইখান হইতেই যেন তাহার নূতন জীবন আসিল। শিমলার রাখাল তিরোহিত হইয়া ঋষিকুমার হইল।

—সপ্তম ভাষণ—

২৭শে কার্ত্তিক, ১৩৪৬ সাল। ১৩ই নভেম্বর, ১৯৩৯, খৃঃ।

—গুরুগিরি—

কলিকাতায় আগে গুরু মানে বুঝাইত যে, একব্যক্তি মাতব্বরি মুরুব্বিয়ানা করিবে আর তাহাকে নানাপ্রকার আহারাদি করাইয়া দক্ষিণা স্বরূপ অর্থ দিতে হইবে। গুরুগিরি তখন একপ্রকার ব্যবসা ছিল অর্থাৎ শিষ্যের যথা সর্বস্ব এমন কি তাহার বাড়ী ঘরদোর লিখিয়া লইবার উদ্দেশ্য ছিল এবং গুরুকে যথা সর্বস্ব দিলে পরকালে তাহার মুক্তি হইবে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব প্রথম এই গুরুগিরি ভাব বর্জন করিলেন। এই গুরুগিরির যে অত্যাচার তখন ছিল তিনি সেই বিষয়ে একটি হাস্যোদ্দীপক উপাখ্যান বলিতেন। ভাষাটা গ্রাম্য এজন্য

এস্থলে প্রদত্ত হইল না। পরমহংসমশাই হাস্য-কৌতুকে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। তিনি প্রত্যেক উপাখ্যানটিকে হাস্যোদ্দীপক গল্প বলিয়া সমাধান করিতেন। কিন্তু গল্পগুলি অনেক সময় গ্রাম্য ভাষায় হইত এইজন্য এই গ্রন্থে দেওয়া হইল না। দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরের বাগানে এক নূতন ভাব উঠিল। গুরুগিরি নাই, প্যালা দিতেও হইত না অর্থাৎ গুরুর উপদেশ শুনিবার জন্য বা তাহার কৃপা পাইবার জন্য প্রভূত অর্থও দিতে হইত না। পরমহংসমশাই-এর ভিতর প্রভূত শক্তি বা জ্ঞান বা নূতন ভাব ছিল। তিনি যেন অকাতরে উপযুক্ত পাত্র পাইলেই সেই সকল বিতরণ করিয়া দিতেন, প্রতিদানের কোন আশা করেন নাই। দান করিতে আসিয়াছিলেন প্রতিগ্রহ করিতে আসেন নাই।

কাশীপুরের বাগানে যুবকেরা এই অভিনব ভাব দেখিয়া একেবারে আশ্চর্যান্বিত হইয়া উঠিলেন। কারণ এই সময় কয়েকটি যুবক তাঁহার নিকট থাকিতেন। তিনিও যেন অগ্নিমেরুর ন্যায় অগ্নিস্তম্ভ নিরন্তর বিকিরণ করিতে লাগিলেন। এইজন্য যুবকেরা অভিনব ভাব ও প্রণালী দেখিয়া একেবারে বিস্ময়ান্বিত হইলেন। বাংলাদেশে এক নূতন অধ্যায়ের সৃষ্টি হইল, নূতন তরঙ্গ উঠিল, নূতন ভাবস্রোত উঠিল। তাহার পর আর একটি কথা হইল, গুরুর আদেশ পালন। গুরুভক্তি ত সাধারণভাবে হইয়া থাকে কিন্তু গুরুর আদেশ পালন এ এক নূতন কথা অর্থাৎ গুরু যেরূপ আদেশ দিয়াছেন এবং নিজের জীবনে যাহা প্রতিপালন করিয়াছেন তাহাই নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করা অপর ভাবটি হইল সাধনা ও তপস্যা। তর্কবিতর্ক ও মুখের কথাবার্তা ছিল আগেকার দিনের ধর্ম, কিন্তু ইহা যে একটা জীবন্ত শক্তি, প্রাণপ্রদ শক্তি, এ ভাবটা ছিল না। পরমহংসমশাই দেখাইলেন যে, ইহাতে একটা জীবন্ত শক্তি আছে যাহা কথাবার্তার বহু ঊর্ধে, শাস্ত্রপাঠের বহু ঊর্ধে। নরেন্দ্রনাথ এক বন্ধুকে বলিয়াছিলেন—"বইত ঢের পড়া

গেল, কথাবার্তা ত ঢের শুনা গেল, তাহাতেও ত কোন জিনিস পাওয়া গেল না। তবে একবার দেখব যে তপস্যা করে কিছু পাওয়া যায় কিনা। ডুবেছি না ডুবতে আছি। একবার ডুবে তলাটা, মাটিটা পর্যন্ত দেখব, তারপর হয় হবে, না হয় না হবে। কিন্তু অর্ধেক পথ এসে ছাড়ব না অর্থাৎ তপস্যার চরম অবস্থা পর্যন্ত দেখব। এতে প্রাণ থাকে আর যায়।" যুবা রাখালরাজ ও আর সকলেও ঠিক এইভাবে জীবন যাপন করিতে মনস্থ করিল।

আর একটি কথা হইল যে সন্ন্যাস গ্রহণ ও গৃহত্যাগ। বাংলা-দেশে বৈষ্ণব বৈরাগী ছিল এবং গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া পূজা পাঠাদি করিত। কিন্তু সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হওয়া এইটা এক নূতন বিষয়। এজন্য সকলেরই বাড়ীর আত্মীয় স্বজনেরা অল্প বিস্তর বিরক্ত হইয়াছিল। এই কাশীপুর বাগানের বিষয় অনেক কিছু বলি-বার আছে এবং বাংলাদেশের ইতিহাসের একটা নূতন পর্যায় বলিয়া পরিগণিত করা যাইতে পারে। অর্থাৎ প্রচলিত ভাবরাশি পরিবর্তন করিয়া নূতন এক ভাবধারা প্রবাহিত হইল এবং এই ভাবধারা কয়েকটি যুবকের ভিতর আবদ্ধ ছিল। চিন্তা জগতের ভিতর একটা নূতন পন্থা প্রবর্তিত হইল। এইজন্য সাধারণ লোকে এত চঞ্চল হইয়া পড়িয়া-ছিল। পক্ষান্তরে ইহাও বলা যাইতে পারে যে পুরাতন চিন্তাস্রোত তিরোহিত হইল এবং নব চিন্তাস্রোত আবির্ভূত হইল।

গুরুর আদেশে ঘর-সাংসার গৃহস্থাশ্রম সমস্ত ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইয়া তপস্যা করিবে এবং সমস্ত জীবন ঈশ্বর উপলব্ধির জন্য নিয়োজিত করিবে, এইটি একেবারে নূতন কথা। কারণ বাংলাদেশে এ ভাবটি তেমন ছিল না। কারণ তখন গুরুগিরি ভাবটা ও অর্থোপার্জন এইটি ছিল প্রচলিত ভাব। যাহা হউক কাশীপুরের বাগানে, চিন্তাস্রোত নিতান্তই নূতন প্রকার হইয়াছিল, অথচ অপরের কোন বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে নাই। অতিশান্ত ধীর, মাধুর্যপূর্ণ ভাব দিয়া নূতন পন্থা

প্রবর্তিত হইয়াছিল। অপরে নিন্দা, বিদ্বেষ করিবার জন্য কোন উপায় পাইতেছে না, অথচ নূতন পন্থাকে গ্রহণ করিতেও সাহস পাইতেছে না। সমাজের ভিতর এই সময় বেশ একটা আলোড়ন হইয়াছিল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, নরেন্দ্রনাথ নানা গ্রন্থাদি আনিয়া পাঠ করিতেন এবং যুবা রাখালরাজ প্রভৃতি সকলেই নিবিষ্ট মনে শুনিতেন। শঙ্করাচার্যের স্তবে আছে চিদানন্দরূপঃ শিবোহং শিবোহং। নরেন্দ্রনাথ এই স্তবটি সর্বদাই আবৃত্তি করিতেন। ক্রমে সকলেই কথাটি শিখিল, শিবোহং শিবোহং এবং পাত্র অপাত্র ভেদ না করিয়া অনেকেই বলিতে লাগিল শিবোহং শিবোহং। গিরীশবাবু কবি লোক তিনি অপাত্রের মুখে এরূপ শব্দ উচ্চারণ করা পছন্দ করিতেন না। নরেন্দ্র-নাথের মুখে ইহা হইতে পারে কিন্তু যে সে তার ঘরে যাইতেছে এবং কথা কহিতেছে, শিবোহং শিবোহং। গিরীশবাবু তার প্রত্যুত্তর করিলেন,—'সবকোই যব্ শিবোহং হোঙ্গা তব্ নন্দীহোন কোন্ হোঙ্গা। ওঠ্ শালা তামাক সাজ।' অর্থাৎ সকলেই যদি শিব হয় তবে শিবের গাঁজা সাজবে কে? তিনি বিদ্রূপ করিয়া কথাটা বলিয়া-ছিলেন অর্থাৎ সকলের মুখে একথাটা সাজে না।

—অষ্টম ভাষণ—

২৮শে কার্তিক, ১৩৪৬ সাল। ১৪ই নভেম্বর, ১৯৩৯ খৃঃ।

কাশীপুরের বাগানে একদিকে যেমন শাস্ত্র অধ্যয়ন হইতেছে অপরদিকে তেমনি সাধন-ভজন চলিতেছে এবং কখন বা কীর্তনাদি তাহাও হইতেছে। তপস্যা যে একটা জীবন্ত শক্তি ইহাই প্রতিপন্ন হইল। যুবকবৃন্দ একমন, একপ্রাণ, এক উদ্দেশ্য হইয়া রহিল। এমন কি পরিধেয় বস্ত্র পর্যন্ত একই। যখন যাহার সুবিধা হইল সে কাপড় ছাড়িল, কাহারও নিজস্ব বা পৃথক বলিয়া কিছু রহিল না।

বয়োবৃদ্ধদের সহিত অর্থাৎ রামদাদা, সুরেশ মিত্রদের সহিত কিঞ্চিৎ পরিমাণে পার্থক্য হইতে লাগিল। একশ্রেণীর হইল গুরুভক্তি অপর শ্রেণীর হইল গুরুর আদেশ পালন। যুবকেরা উচ্চাঙ্গের কথাবার্তা ও অনবরত জপধ্যান করিয়া সকলে বিভোর ও তন্ময় হইয়া থাকিত। নীচু দিকে মন নামাইবার সময় থাকিত না। একটা নূতন জগৎ। নূতন জীবন ও নূতন উদ্দেশ্যের আলোক সম্মুখে আসিল। ভবিষ্যতে রামকৃষ্ণ-মিশন যে সকল ভাব জগতে প্রচার করিতেছে ও করিবে সে সকল ভাব অঙ্কুররূপে এই কাশীপুরের বাগানে পরিস্ফুট হইল। যুবা রাখালরাজ অনবরত জপ করিত সে যেন একেবারে মাখনের মত নরম হইয়া যাইল। দেহেতে তাহার মন থাকিত না। কথাবার্তাও করুণ স্বরে ও স্নেহপূর্ণ স্বরে কহিত। একেবারে নূতন লোক হইয়া যাইল। কাশীপুর বাগানের কথা অনেক কিছু বলিবার আছে ও চিন্তা করিবার আছে কিন্তু এস্থলে সংক্ষেপে সমাপ্ত করা হইল।

এইসময়ে নরেন্দ্রনাথের বাড়ী সংক্রান্ত ব্যাপারে জ্ঞাতির সাথে মোকদ্দমা হয়। পরমহংসমশাই আদেশ করিয়াছিলেন যে মোকদ্দমা জোর করিয়া চালাইবে। ফোঁস করিবে কিন্তু কামড়াইবে না। নরেন্দ্রনাথ তদনুযায়ী মাঝে মাঝে শিমলাতে আসিতেন। এই সময় যুবকদিগের ভিতর কি কঠোর সমস্যা-স্থল আসিয়াছিল; সকলেরই একদিকে সংসার যেন পা ধরিয়া টানিতেছে, অপরদিকে গুরুর আদেশ ও আদর্শ হাত ধরিয়া উপর দিকে টানিতেছে। এই উভয় সঙ্কটের মাঝে সকলে পড়িল। এমন সময় পরমহংসমশাই-এর তিরোধান হইল। অস্থি লইয়া রামদাদার সহিত কিঞ্চিৎ বচসা হইয়াছিল। অবশেষে তাহা মিটিয়া যাইল। এই সকল কথা, 'শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজির জীবনের ঘটনাবলী'তে বিশদরূপে দেওয়া আছে। রামদাদা ও সুরেশ মিত্তির বলিল যে, পরমহংসমশাই-এর তিরোভাব হইয়াছে, অতএব যুবকেরা, নিজ নিজ বাড়ীতে যাইয়া কাজ-কর্ম

করুক অর্থাৎ যাহারা স্কুলে পড়িত তাহারা স্কুলে যাক, যাহারা চাকরী-বাকরী করিতে ইচ্ছা করে তাহাদের উহা করিয়া দেওয়া হইবে। কিন্তু নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলে বলিল যে এইরূপ আদর্শ চোখের উপর দেখিয়া আর সংসারে ফিরিয়া যাইব না। পারি আর না পারি একবার পরমহংসমশাই-এর আদর্শে জীবন যাপন করিব। এই-রূপে বরাহনগরের মঠ প্রথম স্থাপিত হইল এবং নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি যুবকেরা এবং বুড়ো গোপাল (গোপালদাদা) তারকনাথ প্রভৃতি সকলে সমবেত হইল। এই সময়ের কথা বিশদভাবে 'শ্রীমৎ···ঘটনাবলী'-তে দেওয়া আছে এজন্য সংক্ষেপে বলা হইতেছে। কেবল যুবা রাখাল-রাজের কথা বিশেষ করিয়া বলা হইবে।

বরাহনগরের মঠ

এই বরাহনগরের মঠ হইতে রাখালরাজ তাপস রাখালরাজ বলিয়া পরিগণিত হইল। আমাকে সর্বদাই বরাহনগর মঠে যাইতে হইত। কখন কখন রাত্রিতেও থাকিতে হইত, এজন্য ঘটনা সকল চোখে দেখিয়াছি। তাপস রাখালরাজ বাইরের ঘরটিতে অর্থাৎ যে ঘরটিতে কালী বেদান্তী থাকিত সেই ঘরটিতে একটা বালন্দার চ্যাটাই অর্থাৎ হোগলার মত বুননি মোটা মাদুর, সেইটাই উপর বসিয়া বিভ্রান্ত চিত্তে জপধ্যান করিতে লাগিল, কখন বা বাঁ হাতের কনুইটা চ্যাটাই-এর উপর রাখিয়া উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে জপ করিত। মুখে একটি কথা নাই, জগতের সঙ্গে যেন কোন সম্পর্ক নাই, মন দেহ ছাড়িয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে; চক্ষু স্থির ও অন্তঃ দৃষ্টি, মুখ হইতে যেন শান্তিপূর্ণ ভাব বাহির হইতেছে। ভগবান লাভের জন্য মুখে কি কাতর ভাব, যেন কখন তাঁর দর্শন হয়। এইরূপ যোগীর যে সকল লক্ষণ হয়, তাহার মুখে সেই সকল ভাব প্রস্ফুটিত হইল। আমি যাইতাম, দরজার কাছে দাঁড়াইয়া মাঝে মাঝে দেখিতাম, কিন্তু বিশেষ আবশ্যক না

হইলে কথা কহিতাম না। এই সময় তাহার কি কাতর ভাব ও মুখে কি নির্ভরতা ও ঈশ্বর লাভের কি আকাঙ্খা প্রস্ফুটিত হইত নিজের চোখে তাহা না দেখিলে ঠিক বর্ণনা করা যায় না। মহাযোগী ও তপস্বী কি করিয়া হয় ইহা হইল তাহার সূচনা। আমি দাঁড়াইয়া থাকিলে কখন বা দুই একটি কথা করুণ স্বরে বলিত। আমি অকারণে কথা কহিতে ইচ্ছা করিতাম না, কারণ তাহাতে তাহার জপধ্যানের বিঘ্ন হইত।

এই সময় সকলেই কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল এবং সাধারণ ভিক্ষুকের ন্যায় সকাল বেলা চাউল ভিক্ষা করিয়া আনিয়া সিদ্ধ করিয়া লঙ্কার জলে ঝোল করিয়া কাপড়ে ভাত ঢালিয়া সকলে এক সঙ্গে বসিয়া আহার করিত। সে সকল অতি ভীষণ দিনের কথা 'শ্রীমৎ··· ঘটনাবলী', ও 'মহাপুরুষ শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান' এ প্রদত্ত হইয়াছে। আর তাপস রাখালরাজকে বিশেষ কোন কাজ করিতে দেওয়া হইত না। কারণ পরমহংসমশাই বলিয়াছিলেন, "রাখাল আমার দুর্বল ছেলে, নরেন! এইটিকে বিশেষ করিয়া দেখিও।" এই জন্য তাপস রাখালরাজকে কেউ কোন কাজ করিতে দিত না এবং সকলেই তাহাকে বিশেষ স্নেহ ও ভালবাসার চোখে দেখিত। কোন বিষয় সে যেন চঞ্চল না হয়, এই জন্য সকলেই বিশেষ লক্ষ্য রাখিত। তাপস রাখালরাজ কখন বা বরাহনগর মঠে থাকিত, কখন বা বলরামবাবুর বাড়ীতে আসিয়া থাকিত। কারণ বলরামবাবু তাহাকে বিশেষ স্নেহ করিতেন। বরাহনগর মঠে থাকিলে বিশেষ কষ্ট হইবে এই আশঙ্কায় বলরামবাবু তাহাকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিতেন, অর্থাৎ দুই স্থানে সে থাকিত।

—নবম ভাষণ—

১লা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ সাল। ১৭ই নভেম্বর, ১৯৩৯ খৃঃ।

যদিও এই সময় তাপস রাখালরাজ নিজের জপধ্যানে ও তপস্যায় বিভোর থাকিত কিন্তু পূর্ব সম্পর্ক বা পূর্ব ভালবাসা কখনও সে বিস্মৃত হয় নাই। নরেন্দ্রনাথ তাহাকে নিজের অঙ্গ বিশেষ বলিয়া পরিগণিত করিত। ইহাকে ভালবাসা বলে না, কিন্তু নিজের দেহের অংশ বা মনের অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। তাহার ভালবাসার কথা এস্থলে দুই একটি উল্লেখ করিতেছি। একদিন আমার বিশেষ কোন কাজ পড়ে। আমি সকালে বরাহনগর মঠে যাই। তাপস রাখালরাজ নিজের জপ-ধ্যান ছাড়িয়া আসিল, আমরা দুইজনে মিলিয়া পরামাণিকের ঘাটের সন্নিকটে একজনের বাড়ী যাই এবং তথায় যাইয়া সেই লোকটির সহিত কথাবার্তা কহিয়া কার্য নিষ্পন্ন করিয়া দুইজনে ফিরিয়া আসিলাম। আর একদিন আমার কোন কার্যবশতঃ বলরামবাবু, তাপস রাখাল-রাজ ও আমি তিনজনে পাথুরিয়াঘাটায় যদুমল্লিকের বাড়ীতে সন্ধ্যার সময় গিয়াছিলাম। যদিও সে মহাত্যাগী ও নিরবচ্ছিন্ন জপ করিত কিন্তু তাহার পূর্বের ভালবাসা ও অমায়িক ভাব এরূপ প্রবল ছিল যে নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়াও উপকারের জন্য সে সকল কাজ করিয়াছিল। আর একটি কথা, তাপস রাখালরাজকে তাহার বাবা এক জোড়া গোড় তোলা জুতা দেয় অর্থাৎ ইংরাজীতে যাহাকে 'Shoe' বলে, কিন্তু আমার পায়ের জুতাটা খারাপ দেখিয়া সে নিজের জুতাটা আমাকে পরাইয়া দিল। আমি ঢের নিষেধ করিলাম—তাহার কিরূপে চলিবে? কিন্তু সে উদার মনের সহিত বলিল যে সে নিজে এক রকম করিয়া লইবে। তাহাতে কোন সঙ্কোচ করিবার আবশ্যক নাই। অগত্যা আমি তাহার সে জুতাটা পায়ে দিতে লাগিলাম। এই সকল ব্যাপার সামান্য হইলেও কি মহত্ত্বের পরিচায়ক।

ভবিষ্যতে সে যে বিখ্যাত লোক হইয়াছিল এবং বহু সংখ্যক লোকের আশ্রয়স্থল হইয়াছিল ইহাই তাঁহার পূর্ব সূচনা। সামান্য জিনিস হইতেই মানুষের আভ্যন্তরীণ ভাব ও মহত্ব বুঝা যায়। এই সকল প্রত্যেক কর্মটির জন্য আমি তাহার কাছে শতবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি এবং জগতে সকলে বুঝুক যে তাহার প্রাণটা শৈশব হইতেই কত উন্নত ছিল। ভবিষ্যতে এইরূপ বহু সংখ্যক লোকের তিনি নিভৃতে উপকার করিয়াছিলেন। এই জন্য সকলেই তাহাকে এত সম্মান ও ও শ্রদ্ধা করিত। অপর একটি কথা, নরেন্দ্রনাথের যে দিন সবিকল্প সমাধি হয়, সেই দিন সমাধি ভঙ্গের পর প্রথম বলিতে লাগিল, 'কে ও রাখাল, কে ও রাখাল' অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের একান্ত ভালবাসা তাপস রাখালরাজের প্রতি ছিল এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত রাখালরাজ যেন নরেন্দ্রনাথের ডান হাত হইয়াছিল। 'স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী'-তে এ সকল বিষয় বিশেষ করিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

এস্থলে যদিও আমি বিশেষ করিয়া তাপস রাখালরাজের কথা বলিতেছি কিন্তু যুবা শরৎচন্দ্র, যুবা শশী, যুবা তারকনাথ, যুবা কালী, যুবা সারদা, যুবা যোগেন প্রভৃতি সকলেই কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। সমগ্র ভাবে এইরূপ কঠোর তপস্যা জগতের ইতিহাসে অতি বিরল। এই সময়কার ভাব যাহারা না দেখিয়াছেন সমগ্রভাবে তাহারা বুঝিতে পারিবেন না। এইটি হইল পরমহংসমশাই-এর আদর্শ বা তাঁহার শক্তি। ভদ্রঘরের ছেলেরা অনাহারে অনিদ্রায় দিনরাত তপস্যা করিত। বাড়ীতে এতগুলি লোক কিন্তু যেন একটুও আওয়াজ নাই। যে যার নিজের আসনে বা স্থানে বসিয়া একমনে জপ ধ্যান করিতেছে। দেহ রক্ষার জন্য আহার করিত এইমাত্র। আর একটা কথা ভালবাসার যেন স্রোত বহিতে লাগিল। এইরূপ ভালবাসা ইতিহাসে অতি অল্প পাওয়া যায়। এ যেন জীবন্ত ভালবাসা, মুঠো করিয়া ধরা যাইত, কোঁচড়ে করিয়া লওয়া যাইত। ইহাকে ভদ্রতার খাতির বলে না।

স্বার্থ-সিদ্ধির ভালবাসা বলে না কিন্তু প্রাণ বা আভ্যন্তরীণ শক্তি বাহির করিয়া চারদিকে বিকিরণ করা। ইহাকেই বলে ভালবাসার জন্যই ভালবাসা, কোন উদ্দেশ্য করিয়া নয়। ইহাকেই বলে কৈবল্য-প্রেম, পরাভক্তি। গুরু আর গুরুভাই এক। এইরূপ ভাবে পরস্পরকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করিয়া কথাবার্তা কহিত। আর একটা কথা—কাপড়, জুতা, বর্হিবাস সব এক, যার যখন যেটা ইচ্ছা হইতেছে ব্যবহার করিতেছে, না হয় রাখিয়া দিতেছে, নিজস্ব বলিয়া কোন জিনিস ছিল না। এক মন, এক প্রাণ, এক উদ্দেশ্য, কেবল দেহমাত্র পৃথক এইটি ছিল।

সকালে যখন নরেন্দ্রনাথ পাঠ সুরু করিত এবং সকলেই তাহার কাছে শাস্ত্রাদি শুনিতে সুরু করিত, তাপস রাখালরাজ স্থির মনে সকল কথা শুনিত। এজন্য সে গ্রন্থাদি না পড়িয়াও অনেক শাস্ত্র শিখিয়া-ছিল। তাহার মেধা প্রখর ছিল এবং অতি শ্রদ্ধা করিয়া কথাগুলি শুনিত। এই শ্রদ্ধার ভাব থাকায় তাহার ভিতর শাস্ত্রের বাণী প্রস্ফুটিত হইয়াছিল এইরূপে বরাহনগর মঠে তাপস রাখালরাজের কিঞ্চিৎ কথা বলিলাম। যুবা নির্মলানন্দ, যুবা অভেদানন্দ, যুবা শরৎ, যুবা শশী, শিবানন্দ, গঙ্গাধর, সারদা ইত্যাদি সকলেই একমনে তপস্যা করিয়াছিল এবং ভালবাসার এক একটি জীবন্ত মূর্ত্তি হইয়াছিল। প্রত্যেকেরই এইরূপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক উপাখ্যান বলা যায় এবং 'স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী'তে এইরূপ অনেক বিষয় প্রদত্ত হইয়াছে। যাহা হউক বরাহনগরের মঠে এমন একটা আগুন জ্বলিয়াছিল যে তাহার হলকা বা আভা সমস্ত জগতে পরিব্যাপ্ত হইল। আমি প্রত্যেকের কাছে বিশেষ করিয়া উপকার পাইয়াছিলাম, এজন্য সকলকেই আমি প্রণাম করিতেছি ও কৃতজ্ঞতা দেখাইতেছি।

—দশম ভাষণ—

৩রা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ সাল। ১৯শে নভেম্বর, ১৯৩৯খৃঃ।

বলরাম বাবু

১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে শীতকালের সকাল বেলা। একটি লোক মাথায় পাগড়ী বাঁধা, হাঁটু পর্যন্ত একটি লম্বা জামা ও একটি চাদর দু'পাট্টা করিয়া বাঁ কাধ দিয়া ডান বগল দিয়া ফের বগল দিয়া পরা। হাতে একটি ঘেরাটোপ দেওয়া ছাতি। তিনি আসিয়া আমাকে বলিলেন,—'নরেনবাবু আছেন কি?' আমি প্রথমে তাঁহাকে হিন্দুস্থানী মনে করিয়াছিলাম, কারণ এইরূপ ভাবে পাগড়ী বাঁধা ও দু'পাট্টা চাদর বুকে জড়ান ও হাঁটু পর্যন্ত জামা পরা হিন্দুস্থানীদের প্রথা ছিল। কিন্তু যখন স্পষ্ট বাংলায় কথা কহিতে লাগিলেন আমি একটু বিস্মিত হইলাম, তাহারপর নরেন্দ্রনাথের সহিত বেশ কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। পরে জানিলাম যে তাঁহার নাম বলরাম বসু। শ্যামবাজারের কৃষ্ণ বসুদের বাড়ীর ছেলে। তখন তাঁহার বয়স ত্রিশ, বত্রিশ হইবে। এইরূপে মাঝে মাঝে বলরাম বাবু আসায় আমাদের সঙ্গে একটু ঘনিষ্ঠতা হইল। বাবা তখন জীবিত ছিলেন। তিনি কৃষ্ণ বসুদের বাড়ীর ছেলে জানিয়া খুব আদর করিয়া কথা কহিতে লাগিলেন এবং বলরাম বাবুর মিষ্ট কথা ও আচরণে বড় সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। নানা সূত্রে কৃষ্ণ বসুদের সহিত বাবার বিশেষ জানাশুনা ছিল। বলরাম বাবু বাবাকে অতি সম্মান করিয়া কথাবার্তা কহিতেন ও বাবাও বলরাম বাবুর অতি সুখ্যাতি করিতেন।

বলরাম বাবুকে দেখিলাম অতি ধীর, নম্র, বিনয়ী, চোস্ত ভদ্রলোক যা'কে বলে; আচার ব্যবহার অতি মধুর, এবং এত বড় মানুষ ও জমিদার ঘরের ছেলে হইয়াও অত নম্র ও মধুর ভাষী। এরূপ লোক অতি অল্প পরিমানে দেখিতে পাওয়া যায়। ভদ্র আচার ও

বিনয়ী ভাবের তিনি আদর্শ ছিলেন। তাঁহার অজীর্ণ রোগছিল এই জন্য সকাল ও বিকাল বেলা অনেক দূর পায়চারী করিয়া বেড়াইতেন এবং বরাবরই তাঁহার অভ্যাস ছিল, প্রত্যেক পরিচিত ব্যক্তির বাড়ী যাইয়া তাহার সংবাদ লওয়া। ইহাতে ছোট বড় কিছু ছিল না। এই অভ্যাসটি তাঁহার বরাবরই ছিল, এই জন্যই তিনি লোকরঞ্জন হইয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় পরমহংসমশাই যেমন শিমলাতে আসিতেন ও বিশেষ করিয়া রামদাদার বাড়ীতে আসিতেন তেমনি তিনি বলরাম বাবুর বাড়ীতেও আসিতেন, কিন্তু আমি সেখানে কখনও উপস্থিত ছিলাম না। এই জন্য বাগবাজারের প্রথম অবস্থার কথা আমি কিছু লিখি নাই। এই সকল কথা আমার শোনা মাত্র, এই জন্য আমি দিলাম না। যাহা হউক পরমহংসমশাই-এর দেহাবসানের পর যখন বরাহনগরের মঠ হইল তখন বলরামবাবু বিশেষ করিয়া সহায়ক হইলেন। এই সময় বলরামবাবু একজন প্রধান রসদ্‌দার হইয়াছিলেন। যোগেন মহারাজ প্রভৃতি অনেকেই অধিক সময় বলরাম বাবুর বাড়ীতে থাকিতেন। এই সময় বলরামবাবু কোন কারণ বশতঃ নরেন্দ্রনাথের মারফৎ আমার জন্য দশটাকা পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, এই জন্য আমি তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

এই সময় হইতে বলরামবাবু আমাকে অতি স্নেহ করিতেন। অনেক সময় সকালে আসিয়া রামতনু বসুর গলির বাড়ী হইতে আমাকে সঙ্গে করিয়া নানা স্থানে লোকের সহিত সাক্ষাৎ করাইতেন; অবশেষে হেদুয়ার উত্তর মোড় পর্যন্ত এক সঙ্গে যাইতাম। তিনি বাগবাজার চলিয়া যাইতেন, আমি ফিরিয়া আসিতাম। কখন বা রবিবার দিন হইলে আমাকে লইয়া গঙ্গার ধার দিয়া বরাবর যাইয়া বাগবাজার খালের রেলের পুলটির উপর দিয়া চলিয়া কাশীপুর ইত্যাদি স্থান দিয়া যাইয়া ঝাউবাগান ইত্যাদি স্থানে যাইতাম। তখন কাশীপুরে ঝাউবাগান বলিয়া একটি সুন্দর বাগান ছিল। এক এক-দিন ঝাউ-

গাছের নীচে ইটের উপর দু'জনে কাছাকাছি বসিতাম সেই সময় তিনি নানারূপ উচ্চ ভাবের কথা বলিতেন। তারপর খানিকক্ষণ জিরাইয়া সড়ক দিয়া আবার বরাহনগরের মঠে যাইতাম। আবার দুই জনে হাঁটিতে হাঁটিতে ফিরিয়া আসিতাম। তিনি বাগবাজারে যাইতেন আমি শিমলায় আসিতাম। এইরূপে সকালে হোক বা বিকালে হোক প্রত্যেকদিন তাঁহার সঙ্গে থাকিতাম। তাঁহার অমানুষিক ভালবাসা ছিল এবং অনেক সময় আমাকে লইয়া বেড়াইতে যাইতেন। এইজন্য আমি তাঁহাকে শতবার প্রণাম করি। পূর্বে দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরে বলরামবাবু শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের রসদ্‌দার ছিলেন। এখন হইতে বরাহ-নগরের মঠের এক প্রকার রসদ্‌দার হইলেন। অর্থাৎ এই সময়ে তিনি বিশেষ সহায়ক না হইলে বরাহনগরের মঠের বিশেষ ব্যাঘাত হইত। তবে একথা ঠিক স্পষ্ট করিয়া বলা যায় না, কারণ দৃঢ় প্রতিজ্ঞার ভাবও তপস্যার শক্তি অন্য দিকেও পথ করিয়া লইতে পারে। যাহা হউক বলরামবাবু বিশেষ ভাবে এই সময়ে মঠ স্থাপনের প্রয়াসী ছিলেন এবং অনেকেই কখনও বা মঠে কখনও বা বলরামবাবুর বাড়ীতে থাকিতেন। কেবল শশী মহারাজ মঠ ছাড়িয়া কখনও যান নাই। তিনি সেবায় জীবন সমর্পণ করিয়াছিলেন, এই জন্য তিনি কলিকাতায় আসিতেন না। কেবল সুরেশ মিত্তিরের অসুখ বেশী হইলে এবং শেষ অবস্থায় তিনি শশী মহারাজকে দেখিতে চাহিয়াছিলেন. এই সময় শশী মহারাজ টানা গাড়ী করিয়া সুরেশ মিত্তিরের সহিত আধ ঘণ্টা কথাবার্তা কহিয়া পুনরায় চলিয়া যাইলেন, এটা সন্ধ্যার সময় হইয়াছিল।

একদিন বলরামবাবু সকাল বেলা আসিলেন। রামদাদার বাড়ীর নিকটে তিনু কাঁসারীর কাছ থেকে একটা তামার কৌটা লইলেন, তাহার পর দুইজনে, রামদাদার ঘরে যাইলাম। রামদাদা জিজ্ঞাসা করিলেন,—"বলরাম! তামার কৌটায় কি হইবে? বলরামবাবু উত্তর করিলেন, তামার কৌটায় ঠাকুরের অস্থি রাখা হইবে। তদবধি

তামার কৌটায় অস্থি রহিয়াছে। আমরা দুজনে হেদোর ধার পর্যন্ত যাইলাম, তাহারপর আমি ফিরিয়া আসিলাম। আর একটি কথা এস্থলে উল্লেখযোগ্য যে, আমার প্রতি তাঁহার আশ্চর্য ভালবাসা ছিল। এই সকল হইতেছে পুরাতন কথা; কিন্তু ভবিষ্যতে লোকে যেন বুঝিতে পারে যে সেই সময়ে ভালবাসার স্রোত ও তরঙ্গ উঠিয়াছিল এবং পরস্পরকে কিরূপ শ্রদ্ধা ভক্তির ভাবে দেখিত তাহারই কিছু নমুনা স্বরূপ কয়েকটি উপাখ্যান প্রদত্ত হইতেছে।

প্রথম যখন ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ব্যামো হয়; বলরামবাবু, অতুলবাবু, নিরঞ্জন মহারাজ ও আমি রবিবার সকালে গোপাল কবিরাজকে দেখিতে যাইলাম; কারণ কয়েকদিন তাহার ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা হইয়াছে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিউমোনিয়াও হইয়াছে। বলরামবাবু ঠাট্টা করিয়া বলিলেন—"কোবরেজ এবার বোধহয় লুচির খোলা জ্বলল"। গোপাল কবিরাজ আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—'এমন কপাল কি হবে, অবগণ্ড ছেলেগুলি রেখে চলে যাচ্ছি।' এইরূপ কথাবার্তা কহিয়া আমরা চলিয়া আসিলাম। সেইসময় থেকেই বলরামবাবুর ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা ধরিল। আমি কয়েকদিন পর বলরামবাবুর বাড়ী যাই। দেখি, বলরামবাবুর নিউমোনিয়া হইয়াছে। সমস্ত দরজা জানলা বন্ধ করিয়া দিয়াছে। শিবানন্দ, নিরঞ্জন মহারাজ ও গুপ্ত সেবা-শুশ্রূষা করিতেছে অর্থাৎ বলরামবাবুর বিছানার কাছটিতে বসিয়া আছে, সারদা ও যোগানন্দ ছোট ঘরটিতে বসিয়া। বলরামবাবুর স্থানটি হইল পূর্বদিকের প্রথম দরজা ও দ্বিতীয় দরজার মধ্যস্থিত স্থান অর্থাৎ পূর্বদিকের জানলার একটু নীচু দিকে ঠিক মাঝখানটিতে। তখন শ্বাসরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে। তাকিয়ার উপর তাকিয়া দিয়া তিনি মাথা রাখিয়াছেন। মুখে ও শ্বাসে পুতিগন্ধ হইয়াছে। আমি কাছে গিয়া বসিলাম। তখন তাঁহার শরীরে মহাযন্ত্রণা ও অসাড় হইবার আশঙ্কা, কিন্তু তাঁহার এমন অমানুষিক ভালবাসা যে আমি যাইবামাত্রই বাড়ীর

প্রত্যেক লোকের নাম করিয়া সংবাদ লইতে লাগিলেন। খানিক পরে বলিলেন—"মহিম, ওঘরে চা আছে, খাওগে যাও।" আমি যে চা ভালবাসিতাম এটা তাঁহার স্মরণ ছিল। কি আশ্চর্য ভালবাসা। মৃত্যুকালে পর্যন্ত সকলের প্রতি তাহার মঙ্গল কামনা ও প্রগাঢ় ভালবাসা, অথচ তাহার দেহ অবসান হইতেছে। এইটি হইল একটি দৃষ্টান্ত মাত্র। পরাভক্তি, কৈবল্যপ্রেম ও নিঃস্বার্থ ভালবাসা কি, এইসকল মহাপুরুষের ক্রিয়াকলাপ হইতে ভবিষ্যৎ জগৎ শিখিবে। ভালবাসার যে একটা জীবন্ত শক্তি ও জীবন্ত মূর্তি আছে, এইসময় তাহা দেখিতে পাওয়া যাইত। ভবিষ্যতে যেন প্রত্যেক লোক বলরাম বাবুকে বিশেষ ভক্তিশ্রদ্ধা করে এইটি আমার বিশেষ অনুরোধ। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের কি প্রভাব ছিল যাহা সাধারণ লোককে দেবতা করিতে পারিতেন এইটি তাহার একটি উদাহরণ। এইজন্য বলরাম বাবুকে কোটী কোটী প্রণাম করি। বলবামবাবুর বিষয় অনেক উপাখ্যান আমার স্মরণ রহিয়াছে, কিন্তু এস্থলেপ্রদত্ত হইল না।

বলরামবাবুর জন্মতিথি হইল স্নান যাত্রার দিন।

—একাদশ ভাষণ—

৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ সাল। ২০শে নভেম্বর, ১৯৩৯ খৃঃ।

সুরেশ চন্দ্র মিত্র

সুরেন্দ্রনাথ মিত্রকে পাড়ায় আমরা সুরেশ মিত্তির বলিয়া ডাকিতাম। তাঁহার বাড়ী আমাদের বাড়ীর (সিমলার বাড়ী) সংলগ্ন, ভিতরকার পুকুর দিয়া যাওয়া যাইত। তবে সদর দরজা ভিন্ন ও ভিন্ন রাস্তা। তিনি সওদাগরী অফিসে মুচ্ছদ্দি ছিলেন। তাঁহার বিশেষ গুণ ছিল, তিনি মুক্তহস্ত পুরুষ। রামদাদার সমবয়সী এবং এক পাড়ার লোক। এইজন্য রামদাদার সহিত বিশেষ ঘনিষ্ঠতা

ছিল। আমাদের অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া আমরা তাঁহাকে সম্মান করিয়া চলিতাম। রামদাদা তাহাকে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসমশাই এর কাছে লইয়া যান। তদবধি তিনি পরমহংসমশাই-এর বিশেষ অনুগত ছিলেন। পরমহংসমশাই রামদাদার বাড়ীতে আসিলে সুরেশবাবু উপস্থিত থাকিতেন এবং কাজকর্ম দেখাশুনা করিতেন। পাড়ার একজন গণ্যমান্য লোক, এজন্য সকলে তাঁহাকে সম্মান করিত। পরমহংসমশাই কয়েকবার সুরেশবাবুদের বাড়ীতেও গিয়াছিলেন। সে সকল কথা অন্য গ্রন্থে দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এস্থলে বর্জন করা হইল। যাহা হউক, সুরেশবাবু পরমহংসমশাই-এর একজন রসদ্‌দার ছিলেন অর্থাৎ কাশীপুর বাগানের খরচপত্র অনেকটা তিনি বহন করিতেন।

পরমহংসমশাই-এর দেহান্ত হইলে লাটু, গোপালদাদা ও তারকদাদার থাকিবার জন্য সুরেশ মিত্তির একটি স্থান নির্বাচন করিতে মনস্থ করিলেন। এইরূপে তাহার উদ্যোগেই বরাহনগরের মঠ হয়। তিনিই প্রথম সাহস করিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়াই বরাহনগরের মঠ স্থাপন হয় এবং ব্যয় বহন করিতেও তিনি সম্মত হইয়াছিলেন।

তখন সুরেশবাবুর অফিস কাশীপুরে ছিল। তিনি অনেক সময় অফিসের পর বিকালে বরাহনগর মঠে গিয়া দেখাশুনা করিয়া চলিয়া আসিতেন এবং কখন বা রবিবারে যাইয়া সারাদিন থাকিতেন। তাঁহার কথা ছিল—আমরা সংসারী লোক, আমরা সারাদিন কাজকর্ম লইয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিতেছি একটা জুড়াইবার স্থান না হইলে বাঁচিব কি করিয়া। ঠাকুরের নিজস্ব স্থান হওয়া আবশ্যক।

আমি কখন কখন বিকালবেলা সুরেশ মিত্তির-এর গাড়ী করিয়া বরাহনগর মঠ হইতে শিমলায় ফিরিয়া আসিতাম। তাহার একটি প্রথা ছিল কাশীপুর বাগানের কাছ দিয়া গাড়ী আসিলে তিনি গাড়ী থামাইয়া বাগানকে লক্ষ্য করিয়া পরমহংসমশাই-এর উদ্দেশ্যে অতি

ভক্তিভাবে প্রণাম করিতেন। এইসকল হইতেছে বরাহনগরের মঠে
প্রথম অবস্থার কথা। কোন কোনদিন নিরঞ্জন মহারাজও গাড়ীতে
থাকিতেন। সুরেশবাবু অতি কাতর ও আগ্রহ সহকারে নিরঞ্জন মহা
রাজকে বলিতেন—"নিরঞ্জন, এই বাগানটা কিনে নাও, যা খরচ লাগে
আমি দিব।" ঠাকুরের একটা নিজস্ব স্থান হওয়া নিতান্ত আবশ্যক
নইলে সকলে ছোড়ভঙ্গ হইয়া যাইবে। একটা স্থান হইলে সকলে এ
জায়গায় দেখাশুনা করা যাইতে পারে। নিরঞ্জন মহারাজেরও তখ
তীব্র বৈরাগ্য; তিনি বলিলেন সাপ ও সাধু পরের গর্তে থাকে
নিজের একটা স্থান করিলে আবার সংসারী ভাব হইবে। এইজ
তিনি সম্মত হইলেন না। সুরেশবাবু সকলকেই এইরূপে অনুন
করিয়াছিলেন, কিন্তু তখন তীব্র বৈরাগ্য, কেহই তাহাতে সম্মত হ
নাই। অবশেষে তিনি দুঃখিত হইয়া বলরামবাবুর কাছে পাঁচশ
টাকা জমা রাখিয়াছিলেন।

সেইসময় নরেন্দ্রনাথের বাড়ীর মোকদ্দমা চলিতেছিল, এইজ
বলরামবাবুর নিকট হইতে সেই টাকা ধার নেওয়া হয় এ
কয়েক মাস পরে সেই টাকা বলরামবাবুকে ফেরত দেওয়া হয়
শরৎ মহারাজ ও আমি সেই টাকা ভাঙ্গাইয়া আনিয়া (কোম্পানী
কাগজ) বলরামবাবুকে দিয়াছিলাম।

সুরেশবাবুর শেষটায় উদরী ব্যামো হয়। শশী মহারাজ একদি
বিকালে বরাহনগর হইতে সুরেশবাবুকে দেখিতে আসেন এ
আমিও সঙ্গে ছিলাম। তাহারপর সুরেশবাবুর দেহাবসান হয়
সুরেশবাবুর জন্মতিথি হইল জামাইষষ্ঠীর দিন সেইজন্য আলমবাজ
মঠে কয়েকবার সুরেশবাবুর জন্মতিথি পূজা হইয়াছিল। এ
সুরেশবাবুর প্রতি যেন সকলে সম্মান রাখে। আমি শুনিয়াছি
সুরেশবাবুর এই পাঁচশত টাকা দিয়া ঠাকুরঘরের মেঝের মার
পাথর কিনিয়া দেওয়া হইয়াছিল। স্বামীজী আমেরিকা হইতে ফিরি

আসিয়া সুরেশ মিত্তির-এর প্রতি সম্মান দেখাইয়া বলিয়াছিলেন,—"ওরে এটা সুরেশ-মঠ নাম হওয়া উচিত, কারণ তিনিই প্রথম উদ্যোগী হইয়াছিলেন তা' না হ'লে আমরা সকলে ভেসে যেতুম।" যাহা হউক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের বিশেষ রসদ্দার ও ভক্ত তিনি ছিলেন। এইজন্য রামকৃষ্ণ গোষ্ঠীর ভিতর সকলেই যেন তাঁহাকে সম্মান দেখান। তাহার অপর সকল ঘটনা অন্যান্য গ্রন্থে থাকায় এস্থলে দিলাম না।

মাষ্টারমশাই

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত

রামদাদার বাড়ীতে যখন পরমহংসমশাই আসিতেন তখন হইতে মাষ্টারমশাই রামদাদার বাড়ী যাইতেন। কিন্তু কবে তিনি দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন এবং কিরূপে পরমহংসমশাই-এর সহিত সাক্ষাৎ হইয়াছিল তাহা আমার পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে স্মরণ নাই। তাঁহার বাড়ী গুরুপ্রসাদ চৌধুরীর গলিতে, এইজন্য নরেন্দ্রনাথের সহিত তাঁহার আলাপ ছিল। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের পূর্বে তিনি মাষ্টারী করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। এইজন্য সুরেশ মিত্তির ও সকলে তাঁহাকে মাষ্টার বলিয়া ডাকিতেন। তিনি অতিশয় ধীর, নম্র ও তখন অতিশয় অল্পভাষী ছিলেন। মাষ্টার-মশাই কেশববাবুদের বাড়ীর জামাই হওয়ায় কেশববাবুর সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। মাষ্টারমশাই-এর কাছেও শুনিয়াছি ও হৃত মুখুজ্যের কাছেও শুনিয়াছি যে কেশববাবু তাহার অনুগত লোকদের লইয়া একটা ষ্টিমার করিয়া দক্ষিণেশ্বরে গিয়াছিলেন। মাষ্টারমশাইও সেই সাথে ছিলেন, এবং দক্ষিণেশ্বরের বড় ঘাটটিতে দাঁড়াইয়া গঙ্গার দিকে মুখ করিয়া কেশববাবু একটা বক্তৃতাও করিয়াছিলেন। এই বক্তৃতার বিষয় অনেকেই জানেন। মাষ্টারমশাই পরমহংসমশাই-এর একজন অন্তরঙ্গও ছিলেন।

বরাহনগর মঠ প্রথম স্থাপিত হইলে মাষ্টারমশাই স্কুলের ফেরতা বরাহনগর মঠে প্রায়ই যাইতেন এবং সেখানে রাত্রিতে থাকিয়া সকালে বলরামবাবুর বাড়ী হইয়া ফিরিয়া আসিতেন। আমিও কখন কখন রাত্রিতে বরাহনগর মঠে থাকিতাম এবং সকালে দুইজনে একসঙ্গে চলিয়া আসিতাম। এইসময় মাষ্টারমশাই দু'জায়গায় মাষ্টারী করিতেন। একস্থানের বিত্ত তিনি নিজের সংসারে দিতেন, অপর-স্থানের বিত্ত তিনি মঠে দিতেন। এইরূপে তিনিও প্রথম অবস্থায় বরাহনগর মঠের কয়েক মাস রসদ্‌দার ছিলেন। তাহারপর প্রথম বছরের পর চৈত্র বা বৈশাখ হইতে তিনি সর্বদা যাতায়াত আর করিতেন না, যদিও সর্বদা খবরাখবর লইতেন। এই রামকৃষ্ণ সংঘের ভিতর মাষ্টারমশাই একজন প্রমণ্য লোক। তিনি নানাবিষয়ে আমার অনেক উপকার করিয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে শতবার প্রণাম করি।

কেদার নাথ দাস

পরমহংসমশাই-এর কাছে কেদারনাথ দাস বলিয়া একজন লোক যাইতেন। তিনি বাগবাজারে খড়ের ব্যবসা করিতেন এবং বেশ সঙ্গতিপন্ন লোক হইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে খড়ো কেদার বলা হইত। তিনি অনেক সময় সন্ধ্যার পর বলরামবাবুর বাড়ীতে আসিয়া সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতেন এবং বেলুড় মঠেও অনেকবার গিয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি সকলের সঙ্গে বেশ ঘনিষ্ঠভাবে থাকিতেন এবং শরৎ মহারাজের বিশেষ অনুগত ছিলেন। এস্থলে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, বরাহনগর মঠের সময় নরেন্দ্রনাথের বাড়ীর মকদ্দমা চলিতেছিল। খড়ো কেদার একশত টাকা নরেন্দ্রনাথকে দিয়াছিল। এইজন্য তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি এবং এইরূপ আমার শোনা আছে যে, প্রথম

উদ্বোধন অফিস যে জমিতে হয় সেই জমিও নাকি খুড়ো কেদার দিয়াছিল। যাহা হউক খুড়ো কেদার সাবেকি লোক বলিয়া সকলেই তাঁহাকে বিশেষ যত্ন করিত।

—দ্বাদশ ভাষণ—

৫ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ সাল। ২১শে নভেম্বর, ১৯৩৯ খ্রীঃ।

পূর্বে বরাহনগর মঠের তপস্যার কথা বলিয়াছি, কিন্তু তৎসময়কার সহায়ক বা গৃহী ভক্তদিগের কথা কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক বিবেচনা করায় বলরামবাবু প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিলাম। বরাহনগর মঠে যদিও অনেকগুলি লোক থাকিতেন কিন্তু বাড়ী যেন নিস্তব্ধ। সকলেই নিজ নিজ স্থানে বসিয়া জপধ্যান করিতেছেন। তবে কখন কখন মনটা নামাইবার জন্য পরস্পরে হাসি তামাসা বা একটু আধটু চাপল্য ভাব করিত।

এখন আমার বয়স অধিক হইয়াছে। সেই পূর্ব কথা সকল স্মরণ করিয়া দেখিতেছি যেন স্বর্গটা মর্তে নামিয়া আসিয়াছিল অথবা ঋষিকুল যেন পুনরায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। এই সময়কার কথা-বার্তা ও কার্য প্রণালী সকলই ভবিষ্যৎ জগতের একটা আদর্শ হইয়া থাকিবে। কি করিয়া সামান্য অবস্থা হইতে ঋষিত্ব পাওয়া যায় ইহাই এস্থলে প্রকাশ পাইয়াছিল।

যাহাহউক, পরমহংসমশাই যুবা রাখালরাজকে বিশেষ স্নেহ করিতেন এবং নরেন্দ্রনাথের হাতে তাহাকে সমর্পণ করিয়া দিয়াছিলেন, এজন্য তাপস রাখালরাজকে সকলে স্নেহ ও যত্ন করিত। তাপস রাখাল নম্র, বিনয়ী, মিষ্ট ভাষী ও অমায়িক লোক ছিল। এই সময় তাহার জীবনটা অতি কমনীয় হইয়াছিল। নিতান্ত যেন নিরাশ্রয় এবং একমনে একপ্রাণে ভগবানকে যেন খুঁজিতেছে। বরাহনগর মঠে আহারাদির

নানা কষ্ট দেখিয়া বলরামবাবু তাহাকে অনেক সময় নিজের বাড়ীতে রাখিতেন। তাপস রাখালরাজ বড় ঘরটির পূর্বদিক হইতে দ্বিতীয় ও তৃতীয় দরজার মাঝখানটিতে বসিয়া একমনে জপ করিত। সেই সময় তাহার মুখ এত স্থির, গম্ভীর ও স্নিগ্ধ হইত যে অপর কেহ চাপল্য ভাবে ঘরে ঢুকিতে সাহস করিত না। আমি কখন বা সকালে কখন বা বিকালে বলরামবাবুর বাড়ীতে যাইতাম। অধিকাংশ সময় বিকাল বেলা যাইতাম কিন্তু আমি ও যোগেন মহারাজ, পাছে তাপস রাখাল-রাজের কোন কষ্ট হয় বা ধ্যান ভঙ্গ হয় এইজন্য শঙ্কিত চিত্তে বাহিরের বারান্দায় চলিয়া যাইতাম ও কথাবার্তা কহিতাম। অতবড় ঘর, একটি লোক বসিয়া জপ করিতেছে কিন্তু জপের এমন প্রভাব, শক্তি ও এত তেজ বেরুত যে সহসা অপর কেহ যেন ঘরে ঢুকিতে পারিত না। এই সময়কার তাহার মূর্তি যেন বিভোর শিব হইয়া যাইত। ধ্যান যেন বিগ্রহ ধারণ করিয়া একস্থানে বসিয়া থাকিত। এই কথা সকলেই তখন একবাক্যে স্বীকার করিত এবং সেই জন্যে তাপস রাখাল-রাজ সকলের এত প্রিয় পাত্র ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিল। কখন বা সকাল বা বিকাল বেলা বাইরের দিকে বারান্দাতে পায়চারী করিত; তখনও জপ করিত। জপটা যেন বাল্যকাল হইতেই তাহার অস্থি মজ্জায় ছিল এবং শ্বাস প্রশ্বাসের সহিত জপ চলিত। তবে ইহা যেন কেহ মনে না করেন যে সে একনিষ্ঠ হইয়া জপ করিত বলিয়া বোকা হাবা হইয়াগিয়াছিল। সে আমার কোন কাজ পড়িলে তখনই সেই কাজ করিতে যাইত এবং নরেন্দ্রনাথের বাড়ীতে মকদ্দমা চলিতেছিল, এজন্য সাধ্যমত তাহারও সহায় হইত। কখন কখন বা মনটা নামাইবার জন্য বোস পাড়ার এক বৃদ্ধের সহিত ঠাট্টা তামসা করিত। কারণ এই বৃদ্ধটির সহিত আমাদের দুই জনেরই একটা দূর সম্পর্ক ছিল।

এই সময় তাপস রাখালরাজ পুরীতে যায়। যদিও মহাত্যাগী,

কখন কাহারও দ্রব্য গ্রহণ করিত না. কিন্তু নরেন্দ্রনাথের প্রতি এরূপ প্রগাঢ় ভালবাসা যে কোঠার (উড়িষ্যা) হইতে নরেন্দ্রনাথের জন্য একটি আবলুস কাঠের গুড়গুড়ির নল আনিয়াছিল। নলটি অনেকদিন নরেন্দ্রনাথ ব্যবহার করিয়াছিলেন। এই সকল হইল মধুময় স্মৃতি। ভালবাসা যে কি জিনিস ও কি জীবন্ত শক্তি এই সকল মহাপুরুষের কাছ থেকে জগৎ শিখিবে। সামান্য বা তুচ্ছ জিনিস হইলেও ইহা একটি প্রগাঢ় ভালবাসার চিহ্ন। বলরামবাবুর শেষ সময় আমাকে চা খাইতে বলাও ঠিক সেইরূপ ভালবাসার একটি চিহ্ন। ভবিষ্যতে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপাখ্যানগুলি যেন সকলে স্মরণ রাখে। এ যেন একটা ভালবাসার রাজত্ব আসিয়াছিল।

তাপস রাখালরাজ পুরীতে জগন্নাথ দর্শন করিয়া ভাবাবেশে অশ্রু বিসর্জন করিয়াছিল। তাপস রাখালরাজ ফিরিয়া আসিলে নরেন্দ্রনাথ বলরামবাবুর বাড়ীতে তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া বলিত "কিরে শালা রাখাল, জগন্নাথের থরতালের মত চোখ দেখে তুই কেঁদে ফেললি।" এই বলিয়া নিজের দুই চক্ষু বড় বড় করিয়া মুখভঙ্গী করিয়া তাপস রাখালরাজের দিকে চাহিত আর বলিত "কি রে শালা, এই রকম চোখ, এই দেখ।" এইরূপ নিরীহ, শান্ত রাখালরাজের সহিত অনেক সময় ঠাট্টা তামাসা করিত।

এইস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক যে তখন বিকাল বেলা সকলে বলরামবাবুর বাড়ীতে সমবেত হইত। তখন সংখ্যায় অল্প লোক ছিল, এই জন্য সকলে একসঙ্গে সমবেত হইত এবং দুই একজন যদি না আসিত তবে বাড়ীতে গিয়া সংবাদ লওয়া হইত। বিকালে সারদানন্দ, অভেদানন্দ ও আমি গিরীশবাবুর বাড়ীতে চা খাইতে যাইতাম। কখন যোগানন্দও থাকিত কিন্তু সে চা খাইত না। তারপর সকলে বলরাম বাবুর বাড়ীতে ফিরিয়া আসিতাম। পরস্পরের সহিত নিত্য দেখাশুনা হওয়ায় সকলের প্রতি একটা প্রগাঢ় ভালবাসা ও শ্রদ্ধা ছিল। হাসি,

তামাসা, কৌতুক কখন বা চাপল্যের ভিতর দিয়াও পরস্পরের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি দেখান যায় এইস্থলটি হইল তাহার একটি নিদর্শন স্বরূপ। কখনও বা উচ্চাঙ্গের কথা চলিতেছে, কখনও বা সকলে নিস্তব্ধ হইয়া জপ ধ্যান করিতেছে এবং একঘেয়ে ভাব নিরাকরণের জন্য হাসি তামাসাও চলিতেছে কিন্তু সর্বপ্রকার ক্রিয়াই হইল এক জিনিস পরস্পরকে প্রাণ খুলিয়া ভালবাসা। এইটি জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে হইত। ইহা হইল শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের দেবদেহ সূক্ষ্ম শরীরে কি ভাবে কাজ করিত তাহারই নিদর্শন স্বরূপ।

আর একটি কথা, যখন যাহার কিছু সকলকে খাওইতে ইচ্ছা হইত সে চাঙ্গারি করিয়া কিছু খাবার আনিয়া ঘরের এক কোণে রাখিয়া দিত এবং সকলেই ইচ্ছানুযায়ী একটু একটু মুখে দিত তাহা হইলে সকলকেই একসঙ্গে মিষ্টিমুখ করান হইত। এই প্রথাটা অনেকদিন ছিল।

এই বরাহনগর মঠের প্রথম অবস্থাতে রামদাদার একটি মেয়ে আগুনে পুড়িয়া যায়। নরেন্দ্রনাথ, তাপস রাখালরাজ ও নিরঞ্জন মহারাজ শুনিবামাত্রই দৌড়িয়া রামদাদার বাড়ীতে আসিলেন এবং সেবা-শুশ্রূষা যাহা করিবার তাহা করিয়াছিলেন। কিন্তু ছোট মেয়েটি মারা যায়। উপাখ্যানটি বলার এই উদ্দেশ্য যে সাধু হইয়াছিল বলিয়া মন কঠোর হয় নাই, অধিকন্তু মন সরস্ হইয়াছিল। যদিও বরাহনগরের মঠ ও কাঁকুড়গাছির মঠ, দু'টী পৃথক হইয়াছিল কিন্তু রামদাদার প্রতি সকলের পূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধাভক্তি ছিল।

রামদাদার যখন হাঁপানী বেশী হইয়াছিল তখন সকলেই আসিয়া যথাসম্ভব সেবাশুশ্রূষা করিয়াছিলেন। আবশ্যক হইলে সকলেই এক কিন্তু সাধন-ভজনের পন্থা বিভিন্ন এইমাত্র। কেহ না মনে করে তাপস রাখালরাজ আত্মীয় কুটুম্ব হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল। সে আত্মীয় কুটুম্বকে সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তি করিত,

ভাব সাধন-ভজন তাহার জীবনের লক্ষ্য, এইজন্য সবলের নিকট হইতে পৃথক থাকিত।

—ত্রয়োদশ ভাষণ—

৯ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ সাল। ২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৯ খৃঃ।

বরাহনগর মঠের প্রথম অবস্থাতে তাপস রাখালরাজ বলরামবাবুদের উড়িষ্যার জমিদারীতে কয়েকবার গিয়াছিল এবং অল্পদিনের জন্য কয়েকবার বৃন্দাবনেও গিয়াছিল। কিন্তু কিছুদিন বাহিরে থাকিয়া আবার ফিরিয়া আসিত। একটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই, বলরাম-বাবুর বাড়ীতেই থাকুক বা বরাহনগর মঠেই থাকুক বা বাহিরে যেখানেই থাকুক না, তাপস রাখালরাজের জপ করা অভ্যাস অক্ষুণ্ণ ছিল। জপকরা কখনও ছাড়িত না এবং জীবনের শেষ পর্যন্ত এই অভ্যাসটা ছিল।

এইসময় বিশ্বেশ্বরীর (তাপস রাখালরাজের স্ত্রী) চিঠি বরাহনগর মঠে অনবরত আসিতে লাগিল। খামেভরা চিঠি কখন খোলা হইত না। এইসবল নানা কারণে যুবা রাখালরাজ বাংলাদেশ ত্যাগ করিয়া একেবারে বৃন্দাবনে বাস করিতে লাগিল। এইসময় কখন বা বৃন্দাবনে, কখন বা কুসুম সরোবরে কখন বা অন্যত্র কঠোর তপস্যা করিতে লাগিল। তুরীয়ানন্দ স্বামী (হরি মহারাজ) তিনিও এইসময় বৃন্দাবনে ছিলেন। দুইজনে প্রায় একসঙ্গে থাকিতেন। বৃন্দাবন হইতে হরিদ্বার প্রভৃতি স্থানে যান। লক্ষ্ণৌতেও কিছুদিন ছিলেন। হৃষিকেশে নরেন্দ্রনাথের এইসময় উৎকট পীড়া হইয়াছিল। এইজন্য সকলে হৃষিকেশে সমবেত হন। হৃষিকেশ হইতে সকলে মীরাটে আসেন। পরে নরেন্দ্রনাথ রাজপুতনার-দিকে চলিয়া যান। তাহার পরে সকলেই ভিন্ন ভিন্ন দিকে চলিয়া যান। সারদানন্দ এই সময়

হিমালয় পাহাড়টা খুব পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন। শিবানন্দও অনেক-স্থানে গিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই নিজ নিজ ভাবে বিভিন্ন স্থানে কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। এইসকল কথা বিশদভাবে স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী পুস্তকে দেওয়া হইয়াছে। এখানে কেবলমাত্র তাপস রাখালরাজের কথা বিশেষ করিয়া বলিব।

তিনি এইসময় রাজপুতনা, আবু পাহাড় ও গুজরাটের অনেক স্থল পরিভ্রমণ করিয়া বোম্বাইতে যান এবং বোম্বাই হইতে পুনরায় আলমবাজার মঠে ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে গরমীকালে ফিরিয়া আসেন। তিনি অল্পভাষী ছিলেন এবং নিজের কথা বিশেষ বলিতেন না। তবে কখন কখন কথা প্রসঙ্গে নানা স্থানের কথা প্রকাশ পাইত। নাথদোয়ারা অর্থাৎ মীরাবাঈ এর মন্দির দর্শন করিতে গিয়াছিলেন। গুজরাটের পোর বন্দরের কথা মাঝে মাঝে বলিতেন। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে যখন আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিলেন তখন দেখিলাম পূর্বের ন্যায় আর বিষণ্ণভাব নাই। বুকে যেন শান্তি আসিয়াছে, কথাবার্তা অনেকটা গম্ভীর, তবে লাজুক ভাবটা তখনও ছিল।

এই সময় তাঁহার ছেলে সত্যর অসুখ করে। বলরামবাবুর বাড়ী হইতে তাপস রাখালরাজ শিমলাতে আসিতেন এবং আমরা দু'জন কাঁসারী পাড়ার সেনেদের বাড়ীতে ছেলেটিকে দেখিয়া আসিতাম। তারপর তিনি বাগবাজার চলিয়া যাইতেন। কারণ তাপস রাখাল-রাজের বৃন্দাবন অবস্থান কালে বিশ্বেশ্বরীর মৃত্যু হয়। এইজন্য নিরাশ্রয় ছেলেটিকে রোজ সকালবেলা একবার দেখিয়া আসিতেন।

এই সকল ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা দেওয়ার উদ্দেশ্য যে, কিরূপ প্রতিবন্ধক ও ঝঞ্ঝাবাতের ভিতর দিয়া তাঁহার জীবনটা অতিবাহিত হইয়াছিল। কিন্তু একনিষ্ঠ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব থাকায় সমস্ত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অবশেষে এত উচ্চ অবস্থায় উঠিয়াছিলেন। প্রত্যেকেরই তাঁহার এই সময়কার জীবনটা বিশেষ করিয়া অনুধাবন করা আবশ্যক।

কারণ প্রত্যেকেরই জীবনে এইরূপ সঙ্কটাপন্ন অবস্থা ঘটে। গুরুর আদেশ পালন কি মহান বস্তু ইহাই তাহার একটি উদাহরণ। একনিষ্ঠ হইয়া গুরুর আদেশ পালন করিয়াছিলেন বলিয়া ভবিষ্যতে তিনি এত শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার প্রথম জীবনের ঘটনা পাঠ করিলে অনেক কিছু ভাবিবার আছে। প্রত্যেকেই যেন নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী সে সকল বিষয় চিন্তা করিয়া লয়।

কর্মময় জীবন

বরাহনগর মঠে তপস্যারই প্রাধান্য হইয়াছিল। তপস্যা ও অধ্যয়ন এই দুইটি ছিল প্রধান ভাব। আলমবাজারের মঠে প্রথম অবস্থায় তপস্যা ও অধ্যয়ন পূর্বের ন্যায় চলিতে লাগিল। কিন্তু স্বামীজী ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে আমেরিকায় গিয়া ১১ই সেপ্টেম্বর প্রথম বক্তৃতা করেন। তদবধি সকলের ভিতর শক্তি বিকিরণের একটা প্রয়াস আসিল, অর্থাৎ কর্মময় জীবন আরম্ভ হইল। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে তাপস রাখালরাজ বোম্বাই প্রভৃতি স্থান হইতে আলমবাজারে ফিরিয়া আসিলেন। অভেদানন্দ, নির্মলানন্দ ও অখণ্ডানন্দ রাজপুতনা প্রভৃতি স্থান হইতে ফিরিয়া আসিলেন। তুরীয়ানন্দ অন্য কোন স্থান হইতে আসিলেন। শিবানন্দও মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। এইরূপে আলমবাজারের মঠ গুলজার হইয়া উঠিল।

তাপস রাখালরাজের ভিতর তখন বেশ শান্তি আসিয়াছিল কিন্তু পূর্বের মত লাজুক ভাবটি বেশ ছিল। তিনি বসিয়া থাকুন বা পায়চারী করুন সব সময় জপ করিতেন ও কথাবার্তা অল্প কহিতেন। কাজকর্মের দিকে তাঁহার কোনই স্পৃহা ছিল না। তবে মাঝে মাঝে কাহারও কাহারও সহিত ঠাট্টা তামাসা করিতেন। তখন তাঁহার শক্তি সঞ্চয় স্পৃহা অধিক, শক্তি বিকাশ করিবার স্পৃহা বিশেষ ছিল না। তবে পূর্বের বিষণ্ণ ভাবটা কাটিয়া গিয়া অনেকটা শান্তির ভাব আসিয়াছে,

অনেকটা যেন শান্তি পাইয়াছেন। এই সময় অভেদানন্দ ও সারদানন্দ কর্মজীবনে প্রথম প্রণোদিত হইলেন। স্বামীজীর আমেরিকায় প্রচার হওয়ায়, কলিকাতা নগরবাসীর পক্ষ হইতে অভিনন্দন পাঠাইবার জন্য এক সভা আহ্বান করা আবশ্যক হইল। কিন্তু কলিকাতার গণ্য মান্য অনেক ব্যক্তি প্রথমে আপত্তি করিতে লাগিলেন। অবশেষে সারদানন্দ ও বিশেষভাবে অভেদানন্দ অনেকের বাড়ীতে যাইয়া তর্কবিতর্ক করিয়া অনেককে কার্যে প্রণোদিত করিয়াছিলেন। এই সময় টাউন হলে স্বামীজীকে অভিনন্দন দিবার জন্য এক সভা হয়। এইটি হইল প্রথম শক্তি বিকাশের প্রথম কার্য।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে সারদানন্দ ইংলণ্ডে ও তাহার পর আমেরিকায় যান। ঐ বৎসর নভেম্বর মাসে অভেদানন্দ ইংলণ্ডে যান এবং প্রায় ১৯০০ খৃষ্টাব্দে তুরীয়ানন্দ আমেরিকায় যান। ক্রমে কাশীপুর বাগানের, বরাহ-নগর মঠের ও আলমবাজার মঠের প্রথম অবস্থার তপস্যার ভাব কিঞ্চিৎ হ্রাস হইয়া শক্তি বিকিরণের ভাব আসিতে লাগিল। এইরূপে রামকৃষ্ণ মিশন একটি প্রতিষ্ঠান বলিয়া পরিগণিত হইল। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিলেন এবং আলমবাজারের মঠে কিছুদিন থাকিয়া বেলুড়ে নীলাম্বর মুখুজ্যের বাগান ভাড়া করিয়া তথায় থাকা স্থির করিলেন। (মঠের দক্ষিণ দিকের বাড়ী) তাহার পর জমি কিনিয়া বেলুড় মঠ হইল। আমি ১৯০২ সালে স্বামিজীর দেহত্যাগের পর বেলুড় মঠে আসিলাম। এখন হইতে বেলুড় মঠও রামকৃষ্ণ মিশন বলিয়া পরিগণিত হইল এবং এই সময় হইতেই তাপস রাখালরাজের কর্মজীবন আরম্ভ হইল। এখন হইতে তাপস রাখাল "মহারাজ" বলিয়া পরিগণিত হইলেন।

—চতুর্দশ ভাষণ—

২৯শে নভেম্বর, ১৯৩৯ খৃঃ।

গীতায় নিষ্কাম কর্মীর কথা উল্লেখ আছে কিন্তু এ পর্যন্ত ইহা শাস্ত্রেই আবদ্ধ ছিল। সাধারণ লোকের মনের ভাব ছিল যে কর্মী হইলেই নিজের স্বার্থসিদ্ধি, মান, যশ উপার্জন করা এবং সকলের উপর প্রাধান্য স্থাপন করা, ইহাই হইল কর্মীর প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষণ। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা আর একটি নূতন ভাব জগতকে দেখাইলেন। নিঃস্বার্থ কর্মী কাহাকে বলে, মান, যশ প্রতিষ্ঠার কোন আকাঙ্খা না রাখিয়া "বহুজন হিতায় বহুজন সুখায়" কিরূপে কর্ম করিতে হয়, রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম কয়েকটি কর্মী জ্বলন্ত ভাবে দেখাইয়াছিলেন। গীতার নিষ্কাম কর্মীর বিগ্রহরূপ ধারণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ প্রভৃতি সকলে রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপন ও প্রসারণ করিয়াছিলেন। যদি কেহ গীতার নিষ্কাম কর্মীর জীবন্ত মূর্তি দেখিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতির সকলের কর্ম জীবনের প্রসঙ্গ যেন বিশেষ করিয়া আলোচনা করেন। রামকৃষ্ণ মিশন সর্বত্র নানা-প্রকার সেবাকার্য করিতেছেন। প্রত্যেকেই জীবন তুচ্ছ করিয়া মহাবিপদ-সঙ্কুল প্রতিবন্ধক অতিক্রম করিয়া জীব সেবা করিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও নাম উল্লেখ নাই। বিবরণীতে প্রকাশ পাইল যে রামকৃষ্ণ মিশন অমুক স্থানে কার্য করিয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত বা বিপদ সঙ্কুল বিষয়ের কোন উল্লেখ ছিল না। রামকৃষ্ণ মিশন জগতকে এই অভিনব ভাব দর্শাইতেছে। এইজন্য রামকৃষ্ণ মিশন সমস্ত জগতের একটি আদর্শ ও শীর্ষস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত হইতেছে।

আর একটি কথা—নরেন্দ্রনাথ বাল্যকালে রাখালরাজের সহিত কথা প্রসঙ্গে তাহাকে বুঝাইতেছেন যে একের বা সংঘের নেতৃত্ব মানিয়া

চলিলে কার্য প্রসারণ হয়। অসঙ্কোচিত চিত্তে সকলকে ভালবাসা দিতে হয়। অর্থাৎ প্রাণ খুলিয়া অকপট চিত্তে সকলকে ভালবাসা দিতে হয়। ইহা খণ্ড বা আংশিক ভাবে করিলে, বা ভালবাসার ভিতর দ্বিধা বা উদ্দেশ্য থাকিলে তাহা অসম্পূর্ণ হয়। সকলকে আপনার করিয়া লইতে হয়। সকলকে নিজগোষ্ঠী বা নিজের প্রাণের বা দেহের অংশ বিশেষ করিয়া লইতে হয়। অপর হইল, সকলকে সমান অধিকার দিবে। বংশ বা জন্মস্থান অনুসারে কোন পার্থক্য রাখিবে না। সকলে সমান অধিকারের উপযোগী। তবে নিজের ব্যক্তিগত গুণ অনুযায়ী নিজের উৎকর্ষ নিজে সমাধান করিবে অর্থাৎ সকলের পথ মুক্ত করিয়া দিবে। স্বামীজীর আমেরিকার পত্রে এই কথাটি প্রায় থাকিত। "Hands off"—হাত ছেড়ে দাও, লোককে বেড়ে যেতেদাও, লোকের উন্নতির পথ ছেড়ে দাও।" আর একটি ভাব হইল অনুন্নতকে উন্নত করিবে। ভাবটা সীমাবদ্ধ রাখিবে না। অতি নিম্ন শ্রেণীর ভিতরও এই মহান ভাব অকাতরে বিতরণ করিবে। জাতির একটা অংশ বা প্রদেশের জন্য এ ভাব নহে। সমগ্র জাতি ও সমস্ত জগতের জন্য এইভাব অকাতরে বিতরণ করিবে। নরেন্দ্রনাথের বাল্যকালের এই ভাবগুলি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের ভাবের সহিত এক হইয়াছিল। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ব্যক্তি বিভাগ না করিয়া অকাতরে উচ্চ নীচ সকলকে এই ভাব দিয়াছিলেন। এইজন্য নরেন্দ্রনাথ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু যুবা নরেন্দ্রনাথ যখন স্বামী বিবেকানন্দ হইলেন তখন রামকৃষ্ণ মিশনকে এইভাবে প্রণোদিত করিয়াছিলেন এবং এই ভাব রামকৃষ্ণ মিশন সর্বত্র বিকিরণ করিতেছে। এই হইল রামকৃষ্ণ মিশনের আভ্যন্তরিক ভাব। একমন, একপ্রাণ, এক উদ্দেশ্য, একের বা সংঘের নেতৃত্ব মানিয়া চলিলে কিরূপ কার্য সফল হয়, রামকৃষ্ণ মিশন জগতকে এই ভাব দেখাইতেছে এবং এই ভাবটি কতটা সফল করিতে পারিয়াছে এই উপাখ্যানে তাহাই দেখান উদ্দেশ্য।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে স্বামীজীর দেহত্যাগের পর আমি বেলুড় মঠে আসিলাম, এবং ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। উভয়েই পরম বিষণ্ণ ও বিমর্ষ। প্রেমানন্দও তদ্রূপ। সারদানন্দ একবৎসর হইল আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। অভেদানন্দ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ইংলণ্ডে যান এবং তথা হইতে আমেরিকা চলিয়া যান। তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) তিনিও পূর্বে আমেরিকা গিয়াছিলেন, অল্পদিন পরে মঠে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপে সকলেই প্রায় মঠে সমবেত হইলেন।

বরাহনগর ও আলমবাজারের মঠে যেমন তপস্যাই মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল এবং বাহ্যিক জগতের সহিত বিশেষ সম্পর্ক রাখিবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু বেলুড় মঠে অন্য ভাব আসিল। ভাব বিকিরণ করা, ভাব প্রসারণ করা, ইহাই যেন মুখ্য উদ্দেশ্য হইল; অবশ্য তপস্যাও সঙ্গে রহিল। একটি নূতন ভাব এখানে দেখা যাইল। সকলের যেমন পূর্বে স্বামীজীর প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল এখন তদ্রূপ ব্রহ্মানন্দের উপর হইল। ব্রহ্মানন্দের বাল্যকালের চাপল্য, বিষণ্ণ, বিমর্ষ ও লাজুক ভাব অনেকটা চলিয়া গিয়া এখন কর্মী ব্রহ্মানন্দ হইল। এখন যোগী ও কর্মী, কর্মী ও যোগী। এই সময় তাঁহার ভিতর তিনটি ভাব পরিস্ফুট হইল। প্রথম ভাবটি হইল, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের তপস্যার ভাব অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন জপ করা। দ্বিতীয় ভাব হইল স্বামীজীর ক্ষাত্রশক্তি অর্থাৎ ভাব বিকিরণ করা এবং সেই সকল ভাব কর্মে ও প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। তৃতীয় হইল তাঁহার নিজের বংশগত জমিদারী ও অর্থনীতির বিশেষ কোবিদ হওয়া। এই অর্থনীতিতে নদিষ্ণ হওয়া তাঁহার একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল। এইটি পুরাণ জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করায় তাঁহার ভিতর আসিয়াছিল। শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের অর্থনীতিতে তিনি পারদর্শী ছিলেন না, কিন্তু একটা রাজত্ব চালাইবার মত অর্থনীতির কোবিদ ছিলেন কারণ অনেক বিপন্ন

জমিদারী তিনি রক্ষা করিয়া দিয়াছিলেন। জমিদার বা বিপন্ন ব্যক্তিরা এইজন্যে তাঁহার আশ্রয় লইত। যাহাকে ইংরাজীতে Financial Adviser বলে তিনি সেইরূপ ছিলেন। এই বিষয় তাঁহার অদ্ভুত প্রতিভা ছিল। ইহা সাধারণ লোকের ভিতর দেখিতে পাওয়া যায় না। রামকৃষ্ণ মিশনের যে এত প্রসারণ ইহ। তাঁহারই প্রভাবে হইয়াছিল, কারণ কার্য করিতে হইলে, অর্থ প্রধান অঙ্গ। তাঁহার এই শক্তির বিষয়ে কাহারও দ্বিমত নাই। ইহাকে বলে Heredity (বংশের গুণ)। আর একটি তাঁহার শক্তি দেখিতাম—সংগঠন বা Organising power। সংগঠন শক্তি তাঁহার অতি আশ্চর্য ছিল। কোন্ ব্যক্তি কোন্ কার্যের উপযুক্ত, কিরূপে কোন কার্য করিতে হয় অর্থাৎ লোক চরিত্র চেনা তাঁহার এক আশ্চর্য শক্তি ছিল এবং বিভিন্ন ভাবে সকলের মধ্যে সামঞ্জস্য ও সম্মিলন রাখিয়া কিরূপে একটা মহান উদ্দেশ্য সাধিত হয় সেবিষয়ে তাঁহার বিশেষ শক্তি ছিল। এইজন্য স্বামীজী তাঁহাকে President বা অধিনায়ক করিয়া দিয়াছিলেন।

এই সময় ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, প্রেমানন্দ যে যার কার্যের বিভাগ অনুযায়ী ও নিজ ইচ্ছা প্রবৃত্তি অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে কার্য করিতে লাগিলেন। কিন্তু সকলেই একমত, এক উদ্দেশ্য ও এক নেতৃত্ব মানিয়া চলিতেন। এস্থলে কেহ কাহারও অপেক্ষা উচ্চ বা নিম্ন একথা যেন কেহ মনে না করেন। কিন্তু প্রত্যেকেই নিজের বিভাগ অনুযায়ী প্রাণ দিয়া জীবন তুচ্ছ করিয়া কার্য করিয়াছিলেন এবং নিজ নিজ বিভাগ অনুযায়ী কার্যেতে কৃতিত্ব দর্শাইয়া জীবন অবসান করিয়াছিলেন। নিঃস্বার্থ কর্মী নির্লিপ্ত কর্মীর কি আদর্শ হয় তাহাই সকলে দর্শাইয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় যুবা রাখালরাজ বরাহনগর মঠে যেরূপ নির্লিপ্ত সাধু ছিল, কর্মজীবনেও সেইরূপ নির্লিপ্ত মহাকর্মী; ইহা হইল জগতের একটি আদর্শ স্থল।

—পঞ্চদশ ভাষণ—

১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ সাল। ৩০শে নভেম্বর, ১৯৩৯ খৃঃ।

এই সময় ব্রহ্মানন্দের মুখে কখন চাপল্যভাব বিকাশ পাইত অর্থাৎ হাসি কৌতুক ও নানা প্রকার চাপল্য কার্য করিত। কখন বা মুখ গম্ভীর ও দৃঢ় স্নায়ু হইয়া যেন মহাকর্মীরূপে কার্যের উপায় বা পন্থা চিন্তা করিতেছে এবং কার্যে কি করা উচিত তাহা নির্ধারণ করিয়া কার্যের পন্থা নির্ণয় করিতেছে, এবং কখন বা মহাযোগীর ভাব বিকাশ করিয়া ধ্যান করিতেছে। যদিও অনেক লোকের সহিত তাঁহার কথা-বার্তা কহিতে হইত কিন্তু একটি বিশেষ বস্তু লক্ষ্যের বিষয় যে তিনি জপ ঠিক রাখিতেন। একটা বাজে গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়া অপরের মন সেই চিন্তায় রাখিতেন, কিন্তু তিনি ঠিক জপ করিয়া যাইতেন। এখানে একটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় যে তিনি চোখ চাহিয়া জপ ধ্যান করিতেন, চোখ বুজিয়া জপ ধ্যান করিতেন না।

এই সময় কেশববাবুর সমাজের ত্রৈলক্যনাথ সান্ন্যাল, প্রসন্ন সেন প্রভৃতি পাঁচ ছয় জন প্রধান লোক মঠে আসিয়া উঠানটিতে বসেন। ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, প্রেমানন্দ ও আমি তাঁহাদের পিছনে দাঁড়াইয়া রহিলাম। তাঁহারা আক্ষেপ করিয়া একটি কথা বলিয়াছিলেন,— "স্বামীজী চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু আপনারা কেমন একমন একপ্রাণে সকলে কার্য করিতেছেন। আপনাদের কার্য বাড়িয়া যাইতেছে এবং সর্বত্রই বিস্তৃত হইতেছে। কিন্তু কেশব চলিয়া যাইবার পর আমাদের ভিতর বিশৃঙ্খল ভাব আসিয়া গিয়াছে। পূর্বের মত আর টান নাই, একসঙ্গে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করিবার আর ইচ্ছা নাই, সমস্তই যেন এলাইয়া গিয়াছে"। কেশববাবুর সমাজের প্রধান ব্রাহ্ম মহোদয়-দিগের মুখের এই কথাটি বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয়। এই হইল একটি বিশেষ অভিজ্ঞ ন পত্র তারপর তাঁহারা মাঝে মাঝে মঠে

আসিতেন, প্রসাদ পাইতেন ও সারাদিন থাকিতেন। কেশববাবুর সমাজের ও সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের অনেকেই তখন যাতায়াত করিতেন। এই উপাখ্যানটি সামান্য হইলেও অপর সম্প্রদায় রামকৃষ্ণ মিশনকে কি চক্ষে দেখিতেন তাহাই প্রকাশ পাইতেছে। রামকৃষ্ণ মিশন যে এক মহান উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়া নিঃস্বার্থ হইয়া কাজ করিতে পারে ইহাই তাহার এক বিশেষ প্রশংসা পত্র। ব্রহ্মানন্দের বিশেষ কার্যের পর্যায় এস্থলে কিঞ্চিৎ প্রদত্ত হইল। অবশ্য সারদানন্দ প্রভৃতি সকলেই কার্যের সহকর্মী ছিলেন।

স্বামীজীর অবস্থান কালে বেলুড় মঠ ও বালী মিউনিসিপালিটির সহিত ট্যাক্স সম্বন্ধে মামলা হয়। ব্রহ্মানন্দ অসীম পরিশ্রম করিয়া মোকদ্দমা চালান ও জয়ী হন। এই মোকদ্দমার রায় অনুযায়ী রামকৃষ্ণ মিশনের বিভিন্ন স্থানের ট্যাক্স লাগে না। ইহাই একটি নজির হইল। স্বামীজী ব্রহ্মানন্দকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার (স্বামীজীর) মা-এর বাড়ী যেন স্থির করিয়া দেন। তদনুযায়ী ব্রহ্মানন্দ নানাপ্রকার মামলা মোকদ্দমা করিয়া জ্ঞাতিদিগের নিকট হইতে স্বামীজীদের বসত বাড়ী উদ্ধার করিয়া দেন। ইহাতে তাঁহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার কাছে সহস্রবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। স্বামীজী আরও বলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার মাতাকে যেন তীর্থ দর্শন করান হয়। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর ব্রহ্মানন্দ স্বয়ং বন্দোবস্ত করিয়া হাওড়া ষ্টেসানে যাইয়া স্বামীজীর মাতাকে পুরীধামে পাঠাইয়া দেন। এই সময় যেন পূর্বের ন্যায় বাড়ীর রাখালের মত হইয়াছিলেন। এইজন্য তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তাহার কিছুদিন পর রেলকোম্পানী মঠের অর্দ্ধেক জমি লইবার প্রয়াস করিল। ব্রহ্মানন্দ শিবপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী যাইয়া কথাবার্তা কহিয়া এক আমিনকে (Surveyor) আনাইয়া সমস্ত জমি দেখান এবং অতি প্রাচীন নক্স অনুযায়ী জমির সীমানা নির্ধারিত

করিয়া রেল কোম্পানীর হাত হইতে জমি মুক্ত করেন। ইহাতে সারদানন্দও অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন। তাহার পর কাশীর সেবাশ্রমের জমি ও প্রতিষ্ঠান লইয়া একটা গোলমাল হয়। তিনি নানা উপায় উদ্ভাবন করিয়া কাশীর সেবাশ্রমের জমি খরিদ করান এবং কাশীর কর্মীদের দ্বারা নানা উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করাইয়াছিলেন। অর্থনীতি বিষয়ে তাঁহার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তাহার পর কাশীর অদ্বৈতাশ্রমের জমি খরিদ করেন। কাশীর সেবাশ্রমে একটা গোলমাল হইয়াছিল তাহাতে তাঁহাকে আদালতে পর্যন্ত যাইয়া সাক্ষ্য দিতে হইয়াছিল। কনখলের সেবাশ্রম স্থাপনের সময় আর একটা গোল-মাল হইয়াছিল এবং যে ব্যক্তি প্রথম অর্থ দেন তিনি একদিন বিকালে আসিয়া অতি কটু-কাটব্য ভাবে অনেক কথা বলিলেন। ব্রহ্মানন্দ ও আমি পাশাপাশি বসিয়াছিলাম। লোকটা চলিয়া গেলে আমি বলিলাম,—"ও টাকা ফেরৎ দাও! আমরা সকলে মিলিয়া সকলের কাছে যাইয়া চাঁদা তুলিব"। এইরূপ দুমনা ভাবে চলিতেছে, এমন সময় দিন কতক পরে কনখল থেকে এক চিঠি আসিল যে একজন মাড়োয়ারী সমস্ত টাকা দিতে রাজি হইয়াছে। তাহাতেই সমস্ত গোলমাল মিটিয়া যাইল। তাহার পর বৃন্দাবনের সেবাশ্রম বলরাম-বাবুদের কুঞ্জের বাহিরের উঠানে হইল। এই বিষয়ে সারদানন্দ বিশেষ প্রয়াস করিয়াছিলেন। স্বামীজী রামকৃষ্ণানন্দকে মান্দ্রাজে পাঠাইয়া-ছিলেন। সেই সময় সামান্য একটু মঠবাড়ী হয়, তাহার পর মান্দ্রাজে বড় মঠ বাড়ী হইল। প্রথম অবস্থায় বিলিগিরি আয়েঙ্গারের বাড়ীতে ক্যাসল্ কার্নেন (Castle-Carnon) মঠ হয়, পরে নিজস্ব বাড়ীতে মঠ হয়। কিছুদিন পরে বাঙ্গালোরেও আর একটি মঠ স্থাপিত হইল। এইরূপে নানা স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মঠ বা আশ্রম হইতে লাগিল। মায়াবতীর জমি আগে ক্যাপ্টেন সেভিয়ারের সম্পত্তি ছিল, পরে Mrs সেভিয়ারের হয় (যাঁহাকে Mother Saviour বলা হইত)। ব্রহ্মানন্দের

পরামর্শ অনুযায়ী মাদার সেভিয়ার ঐ স্থান মঠকে অর্পণ করেন। এইরূপে ব্রহ্মানন্দের তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও কার্য-কৌশলে রামকৃষ্ণ মিশন নানা স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল। এই সকল বিষয়ে তাঁহার অদ্ভুত শক্তি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। এতদ্‌ব্যতীত ছোট ছোট অনেক কাজ তাঁহাকে করিতে হইত। মঠের সামান্য বিষয়ে মতদ্বৈধ হইলে তিনি অতি সুচারুরূপে মীমাংসা করিয়া দিতেন। এই বিষয় বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই।

স্বামীজী যেমন সমস্ত ভার ব্রহ্মানন্দের উপর দিয়া গিয়াছিলেন, এই গুরুতর ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হওয়ায় ভিতরকার সুষুপ্ত শক্তি যেন অসীম উদ্যমে জাগ্রত হইল। ছেলেবেলাকার বোকা হাবা রাখাল আর রহিল না কিন্তু এক মহাকর্মী ব্রহ্মানন্দ হইল।

এইরূপে তাঁহার উৎসাহে, বুদ্ধিমত্তায় ও পরিশ্রমে নানাস্থানে মঠ স্থাপিত হইতে লাগিল। এতদ্‌ব্যতীত আমেরিকাতেও মিশনের লোক যাইতে লাগিলেন। তুরীয়ানন্দ (হরিমহারাজ) আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ত্রিগুণাতীতানন্দ (সারদামহারাজ) আমেরিকায় যান। তাহার পর সচ্চিদানন্দ (দ্বিতীয় মতিলাল) তিনিও আমেরিকায় যান। তাহার পর বোধানন্দ (হরিপদ) আমেরিকায় যান। পরমানন্দ তারপর আমেরিকায় যান। এইরূপে ব্রহ্মানন্দ যেমন ভারতের ভিতর মিশনের কেন্দ্র প্রসারণ করিতে লাগিলেন তদ্রূপ বাহিরেও প্রসারণ করিবার জন্য লোক পাঠাইতে লাগিলেন। অবশ্য সারদানন্দ প্রভৃতি সকলে সহকর্মী হইয়া কাজ করিতে লাগিলেন। সকলের ভিতর পরস্পরের কি টান ও কিরূপ একমত হইয়া চলিয়াছিলেন ইহাই দেখান উদ্দেশ্য এবং ব্রহ্মানন্দ যে সকল বিষয় অতি সুচারুরূপে সমাধান করিতে পারিতেন তাহাও দেখান উদ্দেশ্য। এইরূপে যে সকলে একমন একপ্রাণ হইয়া কাজ করিতে পারে ইহা জগতে বিরল। গীতার নিঃস্বার্থ কর্মী কাহাকে বলে ইহাই দেখান হইল।

প্রথম অবস্থায় ব্রহ্মানন্দের উদ্যোগে বেলুড় মঠের জমি কেনা হইয়াছিল। উহা প্রথমে একটা সমুদ্রগামী নৌকা তৈয়ারীর কারখানা ছিল। ব্রহ্মানন্দ কঠোর পরিশ্রম করিয়া এই জমি খরিদ করিয়া নানা খাল ও গর্ত বা খানা ডোবা ভরাট করিয়া সমতল জমি করেন এবং প্রথম অবস্থায় বাস করিবার জন্য পুরাণ বাড়ী মেরামত করাইয়া এবং কিয়দংশ নূতন করিয়া বাসের উপযোগী স্থান করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে তাঁহাকে বিশেষ পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। তাহার পর মঠের পোস্তা তৈয়ারী করা ও ঘাট তৈয়ারী করা ইত্যাদি নানাপ্রকার কার্য করিতে হইত। মঠের জমি লইয়া অপরের সহিত প্রায় বিবাদ হইত, অর্থাৎ রেল কোম্পানী ও পাটের কলের সাহেবরা ঐ জমি লইবার প্রয়াস করিত। সেই সকল ঝঞ্ঝাট তাঁহাকে মিটাইতে হইত। এইরূপে নানা বিপদ, বিপত্তি ও প্রতিবন্ধক হইতে মঠকে রক্ষা করিয়া মঠকে নিরাপদ করিয়াছিলেন। প্রত্যেকেই এই বিষয় পরিশ্রম করিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অর্থনীতি দ্বারা সকল কার্য সুচারুরূপে সমাধান হইয়াছিল।

—ষোড়শ ভাষণ—

১লা ডিসেম্বর, ১৯৩৯খৃঃ।

স্বামীজীর তিরোধানের পর মঠের আয় একেবারে কমিয়া গিয়াছিল। যাহা মূলধন ছিল তাহার আয়েতে মঠ চলা দুঃসাধ্য হইল। সেইসময় অর্থাৎ এক বৎসর কাল মঠের বড় টানাটানি অবস্থা হইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ নিজে সমস্ত হিসাব-পত্র রাখিতেন এবং অতি পরিমিত ব্যয় করিয়া মঠ চালাইতে লাগিলেন। ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, প্রেমানন্দ ও অপর সকলে একমন একপ্রাণ ও এক উদ্দেশ্য থাকায় এই দুরূহ সময়টা উত্তীর্ণ হইয়া যাইল এবং স্বচ্ছল অবস্থা

আসিল। এই সময়কার অবস্থা বিশেষ চিন্তা করিবার বিষয়। এক দিকে অর্থের অসচ্ছল অবস্থা অপরদিকে স্বামীজী কার্যভার সকলের উপরে ন্যস্ত করিয়া গিয়াছেন। কিরূপে এই উভয়কূল সংরক্ষণ করিয়া চলিবেন এইজন্য সকলে চিন্তিত হইয়া পড়িলেন কিন্তু একমন, একপ্রাণ, এক উদ্দেশ্য থাকায় এবং একের নেতৃত্ব মানিয়া চলায় সকল প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইলেন। জগতে ইহাই একটি আদর্শস্থল এবং ইহাই একটি দ্রষ্টব্য বিষয় যে স্বামীজীর প্রতি সকলের কিরূপ প্রগাঢ় ভালবাসা ছিল। কি করিয়া স্বামীজীর আদেশ ও উদ্দেশ্য সফল করিবেন এই চিন্তায় সকলেই উৎসাহিত ও দৃঢ় সঙ্কল্প হইলেন। প্রত্যেকেই প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া স্বামীজীর উদ্দেশ্য সফল করিতে লাগিলেন। এইরূপ এক উদ্দেশ্যে কাজ করা জগতের একটি আদর্শস্থল ও শিক্ষণীয় বস্তু। এই কার্যের জন্য ভবিষ্যৎ জগৎ এইসকল মহাপুরুষকে প্রণাম করিবে ও আদর্শ কর্মী বলিয়া গণ্য করিবে। এইরূপ সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য করা জগতে অতি বিরল। ঠিক যেন স্বামীজী সূক্ষ্ম শরীরে কেন্দ্রীভূত হইয়া বিদ্যমান রহিলেন এবং সকলেই তাঁহার উপস্থিতি অনুভব করিয়া দ্বিগুণ উৎসাহে কার্য করিতে লাগিলেন। কার্যভার সকলের মস্তকে অর্পিত হওয়ায় সকলেই প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া নিজ নিজ বিভাগ অনুযায়ী কার্য করিতে লাগিলেন; এবং ব্রহ্মানন্দ শীর্ষস্থানীয় হইয়া, ঠাকুর ও স্বামীজীকে কেন্দ্র করিয়া সকলেই কার্য করিতে লাগিলেন। এইজন্য মঠের ও মিশনের কার্য এত দ্রুতভাবে প্রসারণ হইয়াছিল। সকলের ভিতর যেন অসীম শক্তি আসিল। স্বামীজীর আদেশ সফল করাই যেন জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য হইল। এইরূপ শ্রদ্ধা-ভক্তি ও কার্য-তৎপরতা জগতে একটি শিক্ষণীয় বস্তু।

—সারদানন্দ—

সারদানন্দ মঠে থাকিয়া প্রথমে সমস্ত চিঠিপত্রের উত্তর দিতে লাগিলেন এবং ভারতবর্ষ ও আমেরিকার নানাস্থানে চিঠিপত্র লিখিতে লাগিলেন। এইরূপে তাঁহাকে বাহিরের সমস্ত কাজের ভার লইতে হইল। কয়েকমাস পর তিনি বাগবাজারে গিয়া রহিলেন এবং পূর্বের ন্যায় কখন কখন বলরামবাবুর ও গিরীশবাবুর বাড়ীতে আহার করিতে লাগিলেন এবং কখন বলরামবাবুর বাড়ীতে রাত্রিবাস করিতে লাগিলেন। এইরূপে কোথায়ও আহার কোথায়ও শয়ন করিয়া মঠ ও মিশনের কার্য করিতে লাগিলেন। এদিকে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরাণীরও থাকিবার একটা স্থান চাই। সেইজন্য বাগবাজারে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া তথায় মা ঠাকুরাণীকে রাখিলেন ও নিজে নীচে বাস করিতে লাগিলেন। বাগবাজারের এই বাড়ী হইতে তিনি আর্তত্রাণ কার্য আরম্ভ করিলেন। যখন ভাগলপুরে ভয়ঙ্কর প্লেগ হয় সেইসময় তিনি সদানন্দের (গুপ্ত মহারাজ) সহিত অপর কয়েকজনকে দিয়া ভাগলপুরে পাঠাইলেন। এইরূপে দামোদর বন্যা ও অপর কয়েক স্থলের আর্তত্রাণ কার্য আরম্ভ করিলেন। জীবনের প্রথম অবস্থা হইতেই তাঁহার জনসেবার ভাবটা প্রবল ছিল। বরাহনগর ও আলমবাজার মঠ হইতেই তিনি শুশ্রূষা করা জীবনের প্রধান অঙ্গ করিয়াছিলেন। (গ্রন্থকার প্রণীত 'সারদানন্দের জীবনের ঘটনাবলী'তে এইসকল প্রদত্ত হইয়াছে)। প্রথম তিনি একাই শুশ্রূষা করিতেন, কিন্তু এখন হইতে সংঘবদ্ধ হইয়া সেবাকার্য আরম্ভ করিলেন। এইটি যেন মিশনের অঙ্গীভূত হইল। কেবল তিনি বাংলাদেশেই আর্তত্রাণ কার্য করেন নাই কিন্তু সুদূর পার্বত্য কাঙ্গড়া (পাঞ্জাব) প্রদেশে লোক পাঠাইয়াও এই কার্য করাইয়াছিলেন—এইরূপ আর্তত্রাণ কার্যের জন্য রামকৃষ্ণ মিশন সর্বত্র পরিচিত হইল এবং ভিতরে

যে একটা জীবন্ত শক্তি আছে তাহাও প্রকাশ পাইল। প্রথম যখ কলিকাতায় প্লেগ হইয়াছিল, স্বামীজী নিজেই আর্তত্রাণ কার্য করিয়া ছিলেন এবং অখণ্ডানন্দ-স্বামীকে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। স্বামীজী স্বয়ং-ই আর্তত্রাণ কার্য আরম্ভ করিয়া যান, কিন্ত সারদানন্দ তাহা পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ করিয়া দিলেন। এতদ্‌ব্যতীত দুঃস্থ পরিবারদের বিশেষ সাহায্য করিতেন। তাঁহার প্রাণটা যেন বিগলিত হইয়া আর্ত ও দুঃস্থ ব্যক্তিদিগের জন্য প্রধাবিত হইত অথচ নিজে পূর্বের মত নিতান্ত সামান্যভাবে বরাহনগর মঠের সাধুর ন্যায় থাকিতেন এইসকল হইল তাঁহার মহত্ত্বের বিশেষ পরিচায়ক অর্থাৎ প্রাণ দিয় গায়ের রক্ত জল করিয়া জীবন বিসর্জ্জন দিয়া কিরূপে মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিতে হয় তিনি তাহাই অতি আশ্চর্যরূপে দেখাইয়াছিলেন।

পূর্বে স্বামীজীর আদেশ অনুযায়ী স্বামী ত্রিগুণাতীত (সারদ মহারাজ) উদ্বোধন নামক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। স্বামী ত্রিগুণাতীত আমেরিকা চলিয়া যাইলে স্বামী শুদ্ধানন্দ কয়েব বৎসর উদ্বোধন পত্রিকার ভার গ্রহণ করেন। তাহার পর সারদানন্দ নিজেই উদ্বোধন পত্রিকা সম্পাদনা করিতে লাগিলেন। এইসময় তাহাকে প্রভূত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল—একদিকে শ্রীশ্রীমা-ঠাকুরাণীর ব্যয় সঙ্কুলান করা ও তাঁহার দেখাশুনার ভার, অপর-দিকে চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়া, সকল কেন্দ্রেরই তত্ত্বাবধান করা, অন্যদিকে আর্তত্রাণ কার্যের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা ও তাহার হিসাবপত্র রাখা, দুঃস্থ পরিবারদিগের সাহায্য করা, উদ্বোধন পত্রিকা সম্পাদনা করা এবং স্বামীজীর সমস্ত গ্রন্থ সম্পাদন ও মুদ্রিত করা। এইরূপ বহুবিধ কার্য তিনি একসঙ্গে হস্তে লইলেন। আবার এদিকে মঠের পোস্তা ও ঘাটের পোস্তা নির্মাণ করিবার জন্য গিরীশবাবুর থিয়েটারে সাহায্য রজনী করিয়া টিকিট বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অথচ তিনি বরাহনগর মঠের সেই পুরাতন সাধু ছিলেন।

এইরূপে তাঁহাকে নানা কার্য করিতে হইয়াছিল, এবং এই কার্য করিতে করিতে তাঁহার দেহ অবসান হয়। ক্লান্তি বলিয়া তাঁহার কিছু ছিল না। যদিও স্থূলকায় ব্যক্তি ছিলেন কিন্তু অসীম পরিশ্রম করিতে পারিতেন। এদিকে তিনি লীলাপ্রসঙ্গ গ্রন্থও লিখিতেন। ক্রমে উদ্বোধনের নিজের বাটী হইল। শ্রীশ্রী মাতা-ঠাকুরাণী উপরকার তলায় থাকিতেন এবং নীচের উদ্বোধন অফিসের কার্য হইতে লাগিল। এইরূপে রামকৃষ্ণ মিশনের অতি দ্রুতভাবে প্রসারণ হইল। রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম কর্মীরা মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য স্বেচ্ছায় প্রাণ বিসর্জন করিয়াছিলেন বলিয়াই সহস্র সহস্র লোকের প্রাণ আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিলেন।

—সপ্তদশ ভাষণ—

১৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ সাল। ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৩৯ খৃঃ

প্রেমানন্দ

স্বামীজীর তিরোধানের পর ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দ যেরূপ প্রাণ প্রতিজ্ঞা করিয়া অসীম ধৈর্যসহকারে স্বামীজীর প্রদত্ত ভার ও কার্য প্রসারণের জন্য পরিশ্রম করিতে লাগিলেন অপর সকলেও নিজ নিজ ক্ষেত্র ও সামর্থ্য অনুযায়ী তদ্রূপ কার্য করিতে লাগিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের পন্থানুযায়ী কার্য করায় রামকৃষ্ণ মিশনের এইরূপ দ্রুত প্রসারণ হইয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ ও সারদানন্দ বাহ্যিক কার্যে সংশ্লিষ্ট রহিলেন। প্রেমানন্দও তদ্রূপ আভ্যন্তরিক কার্যে ব্যাপৃত রহিলেন। তিনি মঠের সমস্ত কার্য নিজহস্তে তত্ত্বাবধান করিতেন। এমন কি ঠাকুর পূজা ও ঠাকুরঘরের কার্য হইতে সুরু করিয়া কুটনা কুটা ইত্যাদি সবই করিতেন এবং অভ্যাগত ও ভক্তবৃন্দ আসিলে

তাঁহাদিগের আহারাদির বিশেষ পর্যবেক্ষণ করিতেন। স্বামীজীর তিরোধানের পর প্রথম যেমন মঠে অনটন হইয়াছিল, কিন্তু নানাস্থান হইতে ভক্তবৃন্দ আসায় এবং সকলেই কিছু কিছু দ্রব্যাদি ঠাকুরের সেবার জন্য হস্তে করিয়া আনায় মঠ বেশ সুচারুভাবে চলিতে লাগিল। ক্রমে ক্রমে মঠ খুব জাঁকিয়া উঠিল এবং রবিবার ও বিশেষ দিনেতে ছোটখাট একটি উৎসব হইত। এমন কি চারিশত হইতে পাঁচশত পর্যন্ত লোক প্রসাদ পাইত। এতদ্‌ব্যতীত বহু-লোকের সহিত তাঁহার কথাবার্তা কহিতে হইত। এস্থলে ইহা দেখান উদ্দেশ্য যে কিরূপে সকলে একমন একপ্রাণ হইয়া এক মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য সংঘবদ্ধ হইয়া কার্য করিতে পারে। এস্থলে ইহা বিশেষ লক্ষ্যের বিষয় এই যে প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ ভাব ও নিজ নিজ ব্যক্তিত্ব স্বতন্ত্র রাখিতেন অথচ মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য সকলে সমবেত হইয়া কার্য করিতেন। এইটি জগতের একটি শিক্ষণীয় বিষয়।

শিবানন্দ

শিবানন্দ এই সময় কাশীতে ছিলেন। তখন কাশীর অদ্বৈত আশ্রম ঐ বাড়ীতেই ভাড়া করিয়া স্থাপিত হইয়াছিল। তিনি কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। তিনি স্বভাবতই ধ্যানী ও তপস্বী। এই সময় তাঁহার দুই একখানি কম্বল মাত্র ছিল এবং আহারাদি অতি সামান্যভাবে করিয়া তিনি তপস্যা করিতেন। তাঁহার তপস্যার কথা অন্যত্র (মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান—শ্রীদত্ত) দেওয়া হইয়াছে বলিয়া এস্থলে বিশেষ বিবৃত করা হইল না। তাঁহার কঠোর তপস্যা ও পুণ্যশক্তি প্রভাবে অবশেষে অদ্বৈত আশ্রমের জমি খরিদ করিয়া মঠবাড়ী স্থাপন করা হয় এবং কাশীর সেবাশ্রমও এইরূপে হইয়াছিল। তিনি ছিলেন তাপস ও কঠোর তপস্বী। কঠোর

তপস্যার কি প্রভাব ও শক্তি আছে তাহা পরিশেষে কাশীর প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রকাশ পাইল। সূক্ষ্ম হইতে স্থূল বস্তু কিরূপে আবির্ভূত হয় তপস্যা হইতে কি করিয়া দৃশ্যমান বস্তু আসে ইহা তাহারই একটি জ্বলন্ত উদাহরণ।

তুরীয়ানন্দ

তুরীয়ানন্দ স্বামীজীর সহিত আমেরিকা গিয়াছিলেন এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অল্পদিন মঠে থাকিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছিলেন। ইনি হইলেন জন্মগত যোগী। ইনি বৃন্দাবন, হরিদ্বার প্রভৃতি নানা স্থানে থাকিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। হৃষিকেশে যখন ছিলেন তখন প্রাচীন সাধুরা প্রায় বলিতেন,—"তুরীয়ানন্দ বাঙ্গালী বহুৎ উচ্চাবস্থাকো যোগী।" এইরূপে তিনি উত্তর-কাশীতেও অনেক তপস্যা করিয়াছিলেন। সেইসময় কনখলের নিশ্চয়ানন্দ তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। কাশ্মীরের অমরনাথেও গিয়া-ছিলেন। অবশেষে শিবানন্দ ও তুরীয়ানন্দ আলমোড়ায় একটি কুটির করিয়া তপস্যা করিতে লাগিলেন। পুরীতে শশীনিকেতনে পরে কিছুদিন ছিলেন এবং পরিশেষে কাশীধামে তিনি দেহরক্ষা করেন। তিনি খুব পণ্ডিত ও যোগী ছিলেন। এইরূপে প্রত্যেকেই নানাভাবে ও নানা বিভাগে রামকৃষ্ণ মিশনকে প্রসারণ করিয়াছিলেন।

ত্রিগুণাতীতানন্দ (সারদা)

ত্রিগুণাতীতানন্দ স্বামীজীর আদেশানুযায়ী উদ্বোধন পত্রিকা স্থাপন করেন। এইরূপ শ্রুত আছি যে তিনি ব্যয় সঙ্কুলানের জন্য এক পয়সার ছাতু খাইয়া কিছুকাল দিন যাপন করিয়াছিলেন। এইরূপে বহু প্রয়াস করিয়া উদ্বোধন পত্রিকা স্থাপন করেন এবং ১৯০২ সালে আমেরিকা যাইয়া প্রচার কার্যে সংযুক্ত হন। পরিশেষে সান্‌ফ্রানসিস্‌কো

নগরে একে মঠ স্থাপন করিয়া দেহত্যাগ করেন। তিনি কঠোর কর্মী ছিলেন। মুখে তাঁহার বিশেষ কথা ছিল না।

নির্মলানন্দ

নির্মলানন্দ বরাহনগর মঠে রামকৃষ্ণানন্দের সহকারী ছিলেন। তাহারপর আলমবাজার মঠেও তিনি রামকৃষ্ণানন্দের সহিত সমস্ত তত্ত্বাবধান করিতেন। তিনি খুব পণ্ডিত ছিলেন এবং বহু ভাষায় পণ্ডিতদিগের সহিত বাক্যালাপ করিতে পারিতেন অর্থাৎ শাস্ত্রাদিতে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান ছিল। স্বামীজীর তিরোভাবকালে তিনি কাশ্মীরে ছিলেন এবং সেখানে অসুস্থ হইয়া তাঁহার জীবন সঙ্কটাপন্ন হইয়াছিল। পরিশেষে তিনি মঠে ফিরিয়া আসিয়া ব্যাকরণ ও বেদান্ত পড়াইতে লাগিলেন। অবশেষে তিনি আমেরিকা যান এবং তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া চম্বা ও কুল্লু প্রভৃতি পার্বত্য প্রদেশে তপস্যা করিতে যান। পরিশেষে বাঙ্গালোর মঠে অধিনায়ক হইয়া কার্য করেন এবং দাক্ষিণাত্য প্রদেশে অনেক মঠ ও কেন্দ্র স্থাপন করিয়া নানাভাবে প্রচার কার্য করেন। অবশেষে দাক্ষিণাত্যে তিনি দেহরক্ষা করেন। এইরূপে দাক্ষিণাত্যে তিনি অনেক কার্য করিয়াছিলেন।

রামকৃষ্ণানন্দ

স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া রামকৃষ্ণানন্দকে মাদ্রাজে প্রেরণ করেন। প্রথম অবস্থায় তাঁহাকে বিশেষ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। নানারূপ কষ্টে ও অর্থের অভাবে তাঁহাকে বিশেষ ক্লেশ পাইতে হইয়াছিল। পরিশেষে তাঁহার প্রভাব বিস্তৃত হইতে লাগিল এবং মাদ্রাজে একটি বিশেষ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল। তিনি মাদ্রাজ মঠ কেন্দ্র করিয়া নানাস্থানে প্রচার কার্য করিতেন। তাঁহার পরিশ্রমে ক্লান্তি ছিল না। ইনি হইলেন সারদানন্দের জ্ঞাতি ভাই।

এই সময় তিনি কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি মাদ্রাজ মঠকে ও রামকৃষ্ণ মিশনকে দাক্ষিণাত্যে প্রসারণ করিয়াছিলেন। অবশেষে অতিশয় পরিশ্রমের জন্য যক্ষ্মা রোগ হওয়ায় বাগবাজারের উদ্বোধন অফিসে দেহত্যাগ করেন।

অভেদানন্দ

অভেদানন্দ পূর্বে ইংলণ্ডে যাইয়া পরে আমেরিকা গিয়াছিলেন। অবশেষে তথায় দীর্ঘকাল থাকিয়া প্রচার কার্য করেন। ইনি খুব পণ্ডিত ও সুবক্তা ছিলেন এবং কার্যকুশলতায় বিশেষ পারদর্শীও ছিলেন। বহুকালপর একবার ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন এবং মাস কতক থাকিয়াই পুনরায় আমেরিকা চলিয়া যান। অবশেষে তিনি আমেরিকা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় আসেন এবং বেদান্ত সমিতি স্থাপন করিয়া কলিকাতায় একটি কেন্দ্র করেন এবং নানারূপ প্রচার কার্য করিয়া অবশেষে দেহত্যাগ করেন। তাঁহার রচিত অনেক গ্রন্থ লোকরঞ্জন হইয়াছে, এবং সকলেই তাঁহাকে সুবক্তা ও পণ্ডিত বলিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা-ভক্তি করিয়া থাকে।

বুড়ো গোপাল

বুড়ো গোপাল (অদ্বৈতানন্দ) বরাহনগর মঠ হইতে কাশীতে গিয়া বহুকাল তপস্যা করিয়াছিলেন। অবশেষে বেলুড়মঠ স্থাপিত হইলে তিনি আসিয়া বেলুড় মঠে থাকিতে লাগিলেন। বয়সে বৃদ্ধ এই বলিয়া জোরের কোন কার্য করিতে পারিতেন না। কিন্তু স্বভাবতই কার্য প্রণোদিত ব্যক্তি সেইজন্য মঠের বাগান, বেড়া প্রভৃতি সমস্ত দেখিতেন। এইরূপে তিনিও নিজের সামর্থ্যানুযায়ী মঠ স্থাপনের প্রয়াসী হইয়াছিলেন।

লাটু

লাটু (অদ্ভুতানন্দ) মহাতপস্বী ছিলেন। স্বামীজীর আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কিছু দিন মঠে থাকিয়া বাগবাজারের বলরামবাবুর বাড়ীতেই অধিক সময় থাকিতেন। অবশেষে কাশীতে একটি স্বতন্ত্র বাড়ি লইয়া তপস্যাদি করিতে লাগিলেন। তিনি কঠোর তাপস ছিলেন, এইজন্য কার্যের দিকে তাঁহার তত মন ছিল না। কিন্তু অভ্যাগত ও আগন্তুক, ভক্তদিগের সহিত নানারূপ উচ্চাঙ্গের কথাবার্তা কহিতেন। ইহাও এক প্রকার প্রচার কার্য বুঝিতে হইবে। প্রথম জীবনে যেমন কঠোর তাপস ছিলেন বৃদ্ধ বয়সেও তিনি তদ্রূপ কঠোর তাপস ভাব রাখিয়াছিলেন। কাশীতে অবস্থানকালে কলিকাতা হইতে বহু ভক্ত তাঁহাকে বহু ফল ও মিষ্টান্ন পাঠাইয়া দিতেন। কিন্তু তাঁহার মনটা এত উদার ছিল যে প্রত্যেক ভক্তকে নিজের সম্মুখে বসাইয়া ফল ও মিষ্টান্ন আহার করাইতেন এবং সঙ্গেও দিয়া দিতেন। তাঁহার প্রাণটা যেন একেবারে খুলিয়া গিয়াছিল। লোকজনকে খাওয়াইতে কি ভালবাসিতেন! আমি মাঝে মাঝে কাশীর আশ্রমে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতাম, এবং মাঝে মাঝে তাঁহার অনুরোধে সেখানে আহার করিতাম। এইজন্য নানা কারণে তাঁহার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

সুবোধানন্দ

সুবোধানন্দ (খোকা) মঠে থাকিয়াও নানাস্থানে বিচরণ করিয়া প্রচার কার্যের সহায়ক ছিলেন। এইরূপে প্রত্যেক লোকই মঠ ও মিশন স্থাপন ও প্রসারণ কার্যে সহায়ক ছিলেন।

অষ্টাদশ ভাষণ

১৮ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ সাল। ৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৯ খৃঃ।

সচ্চিদানন্দ

সচ্চিদানন্দ (প্রথম) দীনমহারাজ, ইনি আলমবাজার মঠে প্রথম আসেন। জীবনের প্রথম অবস্থায় [illegible] কন্ট্রাক্টারের কার্য করিতেন। এই জন্য তিনি ইমারতী কাজে বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন। দীনমহারাজ মঠের উঠান প্রাচীর পোস্তা ইত্যাদি সকল কাজ করিয়াছিলেন, এবং কাশীর সেবাশ্রম নির্ম্মাণ কালে তিনি তত্ত্বাবধান করিয়া ইমারতের কাজ করেন। তিনি প্রথম অবস্থায় পর্যটন কালে মহাকঠোর ত্যাগী ছিলেন। তাঁহার জীবনের ইতিহাস অতি আশ্চর্য। তাহা অন্যত্র দেওয়া হইয়াছে ('দীন মহারাজ'—শ্রীদত্ত প্রণীত)। বয়স অধিক হইলে তিনি কাশীর সেবাশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন এবং তথায় তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

বিজ্ঞানানন্দ

বিজ্ঞানানন্দ (হরিপ্রসন্ন) ইঁহার বাড়ী সিঁথিতে। যখন কলেজে পড়িতেন, দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সহিত কয়েকবার সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। তিনি ইন্জিনিয়ারিং পাশ করিয়া সরকারী চাকুরী করেন এবং পদোন্নতি হওয়ায় ডিসট্রিক্ট ইন্জিনিয়ার পর্যন্ত হইয়াছিলেন। স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাগমন করিলে হরিপ্রসন্ন কার্য ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন এবং তিনি ইন্জিনিয়ার থাকায় মঠের ইমারতের কার্য দেখা-শুনা করিতেন। দীনমহারাজ তাঁহার সহকারীরূপে দেখাশুনা করিতেন। কাশীর, কনখলের ও বৃন্দাবনের সেবাশ্রমেও বিজ্ঞানানন্দ ইমারতের কার্য করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেন্ট হইয়া মন্দির নির্মাণে সহায়ক হন,

এবং মন্দিরে ঠাকুরের অস্থি স্থাপন করিয়া তাঁহার জীবনের কার্য সমাপন করিয়া অল্প কয়েক মাস পরে দেহত্যাগ করেন। যদিও বরাহনগর মঠ ও আলমবাজার মঠের প্রথম অবস্থায় হরিপ্রসন্নের সহিত সকলের জানাশুনা ছিল না, কিন্তু তাঁহাকে প্রথম পর্যায়ের লোকের ভিতর গণ্য করা হইল। তিনি এলাহাবাদের মুঠিগঞ্জে আশ্রম করিয়া অধিক সময় বাস করিতেন।

নিত্যানন্দ

নিত্যানন্দের (যোগেন চাটুয্যে) বরাহনগরে পরামাণিকের ঘাটের নিকটে পূর্ব আশ্রম ছিল। বাড়া কাছে হওয়ায় বরাহনগরের মঠে যাতায়াত ছিল। স্বামীজীর প্রত্যাগমনের পর যোগেন চাটুর্যে সন্ন্যাস লইয়া নিত্যানন্দ নাম গ্রহণ করেন, এবং মঠের বাগান বেড়া দেখাশুনা ও অনেক কার্য করিতেন। পরিশেষে বরিশালে তিনি দেহত্যাগ, করেন। ইনি বরাহনগর মঠে যাতায়াত করিতেন। এইজন্য তাঁহাকে প্রথম পর্যায়ের ভিতর গণ্য করিলাম। তাহার বয়স অধিক হইয়াছিল।

অখণ্ডানন্দ

অখণ্ডানন্দ (গঙ্গাধর) শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ দেবের সহিত সর্বদাই সাক্ষাৎ করিতেন। বাগবাজারে বোস পাড়ায় তাঁহার বাড়ী থাকায় বলরামবাবু ও গিরীশবাবুর বাড়ীতে সর্বদা যাতায়াত ছিল এবং নরেন্দ্র-নাথের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট ও অনুগত হইয়াছিলেন। গৃহত্যাগ করিয়া কাশীপুরের বাগানে অখণ্ডানন্দ কঠোর জীবন পালন করিতে লাগিলেন। বরাহনগর মঠ যখন স্থাপিত হয় এবং যখন বৌদ্ধ গ্রন্থ পাঠ হইত তৎকালে অখণ্ডানন্দ বৌদ্ধ গ্রন্থ শুনিয়া বৌদ্ধধর্ম পর্যবেক্ষণ করিবার মানসে তিব্বতে যান। তখন তাঁহার বয়স অতি অল্প। তিব্বতে কয়েক বছর থাকিয়া লাডাক্ দিয়া কাশ্মীরের শ্রীনগরে আসেন এবং পরিশেষে বরাহনগর মঠে প্রত্যাবর্তন করেন। বরাহনগর মঠে তক্ষ

সময় থাকিয়া হৃষিকেশ, রাজপুতনা, গুজরাট প্রভৃতি অনেকস্থান পর্যটন করেন। তাঁহার পর্যটন কাহিনী অতীব আশ্চর্যের। ১৮৯৩ বা ৯৪ খৃষ্টাব্দে তিনি আলমবাজার মঠে প্রত্যাবর্তন করেন এবং তদবধি বাংলাদেশেই অধিক সময় ছিলেন। তিনি স্বামীজীর আদেশে আর্তত্রাণ কার্যের জন্য মুর্শিদাবাদে যান এবং ভাবদা নামক স্থানে আশ্রম স্থাপন করেন। শিবানন্দের তিরোধানের পর তিনি রামকৃষ্ণ মিশনের প্রেসিডেণ্ট হন এবং কয়েক বছর পর দেহত্যাগ করেন।

এই সকল কঠোর তপস্বী সাধকদিগের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইল, কিন্তু সকলেরই পৃথক্‌ভাবে জীবনী লেখা আবশ্যক। কারণ এই সকল মহাপুরুষদিগের কঠোর তপস্যা ও সংঘবদ্ধরূপে কার্য করার দরুণ রামকৃষ্ণ মিশন স্থাপিত হইয়া প্রসারণ লাভ করিয়াছে। প্রত্যেকেই উচ্চ শ্রেণীর সাধক, তপস্বী ও নিঃস্বার্থ কর্মী। প্রত্যেকে গীতার আদর্শকর্মী ও প্রত্যক্ষ মূর্তি। ইহাদিগের নাম ও ক্রিয়াকলাপ ভবিষ্যতে সকলের আদর্শ হইয়া থাকিবে এবং জাতির ভিতর একটা জীবন্ত প্রাণ শক্তি সঞ্চার করিয়া দিবে।

স্বামীজার দেহত্যাগের পর যখন সকলেই বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন তখন কাহাকেও দীক্ষা বা সন্ন্যাস দেওয়া হয় নাই। তখন মঠের অবস্থা কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ প্রভৃতি সকলে সমবেত নিঃস্বার্থ কর্ম করায় মঠের বেশ সচ্ছল অবস্থা হইল এবং প্রসারণ হইতে লাগিল। কয়েক বৎসর পর ব্রহ্মানন্দ দীক্ষা দিতে লাগিলেন, এবং ধীরে ধীরে সন্ন্যাসও দিতেন। প্রথম অবস্থায় অল্প সংখ্যককে দীক্ষা দিয়াছিলেন এবং দুই একজনকে সন্ন্যাস দিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ যদিও সমস্তদিন নানা কার্যে ব্যাপৃত থাকিতেন কিন্তু রাত্রে তিনি অধিক সময় জপ করিতেন। কয়েকমাস তিনি রাত্রে দুধ সাগু খাইতেন এবং পাছে নিদ্রা হয় এই জন্য কাঠের যোগ দণ্ডের উপর হাত রাখিয়া জপ করিতেন। এইরূপে তিনি মহাকর্মী ও যোগী

এক সঙ্গে হইতে লাগিলেন। অতি মিষ্টভাষী, সংযত বাক্, সকলকে সমান ভাবে যত্ন আদর করা এবং খুব মজলিসি অর্থাৎ জমিদার ঘরের ছেলের যেরূপ আচরণ হওয়া উচিত সে সব তাঁহার খুব হইয়াছিল। এজন্য তিনি এত লোকরঞ্জন হইতে পারিয়াছিলেন। প্রত্যেক ব্যক্তির কথাও তিনি শুনিতেন এবং কিরূপে তাহার মঙ্গল হইবে এইরূপ চিন্তা করিয়া দ্বিতীয় বার সাক্ষাৎ হইলে তাহাকে বলিতেন। এইরূপে বহু লোক আসিয়া তাহার নিজের দুঃখ কষ্টের কথা তাঁহাকে বলিয়া যাইত। কিন্তু কখনও একজনের কথা অপরের কাছে বলিতেন না। বাহিরে সর্বদা হাস্যমুখ ও হাসি কৌতুকে বিশেষ নিপুণ। অভ্যাগত ব্যক্তি আসিলে অনেক সময় তিনি তাহাদের উপযোগী একটা গল্প আরম্ভ করিয়া দিয়া নিজে চুপ করিয়া বসিয়া জপ করিতেন। অথচ আগন্তুক ব্যক্তিরা সেই সামান্য তুচ্ছ গল্পটা লইয়া আনন্দিত হইত। তাঁহার লোক-চরিত্র জানিবার ক্ষমতা অদ্ভুত ছিল এবং জমিদার ঘরের ছেলে সেইজন্য বিষয় বুদ্ধি অর্থাৎ জমিদারী বুদ্ধি অতি আশ্চর্য ছিল। অর্থনীতি বিষয়ে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। যাহাকে ইংরাজীতে বলে Financier অর্থাৎ অর্থকোবিদ। তিনি তাহার উচ্চমার্গ জানিতেন। শুধু রামকৃষ্ণ মিশন নয় যদি একটা রাজ্যের ভার তাঁহার হাতে দেওয়া হইত, তাহা হইলে অক্লেশে তাহা চালাইতে পারিতেন। তাঁহার একটা বিশেষ গুণ ছিল যাহাকে Administrator বা সংঘ পরিচালক বলা হয়। Organiser সংঘ গঠক ও financier অর্থকোবিদ। তাঁহারই প্রতিভায় রামকৃষ্ণ মিশন এইরূপ সুচারুভাবে প্রসারণ লাভ করিয়াছিল। জগতে ইহা অতি দুর্লভ জিনিস যে, একজন মহাযোগী ও ত্যাগী হইয়াও এইরূপ রাজনীতিজ্ঞ হইতে পারেন। প্রত্যেক লোকই প্রাণ দিয়া পরিশ্রম করিয়াছিলেন কিন্তু ব্রহ্মানন্দের প্রতিভায় সকলে একমন একপ্রাণ দিয়া কার্য করিয়াছিল। এজন্য ব্রহ্মানন্দকে সকলে এত শ্রদ্ধাভক্তি করিত।

এইরূপ সমস্ত রাত্রি জপ করিয়া তাঁহার ভিতর শক্তি আসিল। সেটা কিরূপভাবে হইয়াছিল তিনি কখনও তাহা প্রকাশ করেন নাই। একদিন নির্মলানন্দ সকালে আমাকে বলিলেন যে, "দেখ মহারাজের ভিতর শক্তি আসিয়াছে।" ইহা একটা উদ্বিগ্নের কারণ। কারণ এই শক্তিটা আসিলে দেহ বেশী দিন থাকে না। আমি শুনিয়া আনন্দিত ও বিষণ্ণ হইলাম। কারণ ইহাতে আনন্দ, হর্ষ ও শোকের ভাব রহিয়াছে। তদবধি আমি বেশ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম যে ছেলেবেলা হইতে একত্রে বাস করায় পরস্পর যেমন চাপল্যভাবে কথা কহিতাম সেরূপভাবে আর কথা কহা উচিত নয় কারণ শক্তিকে সম্মান করিতে হইবে তাহা যাহার ভিতরেই হউক না কেন। এইজন্য একদিন বিজয়ার রাত্রিতে আমি তাঁহার পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিতে গেলাম। অর্থাৎ কোলাকুলি না করিয়া পায়ে হাত দিয়া প্রণাম করিলাম। তিনি চঞ্চল হইয়া বলিলেন কি কর! কি কর! তুমি আবার কি করছ? আমি বলিলাম আমি ঠিক করছি, তুমি এতে বাধা দিও না। সেদিন হইতে আমি তাঁহাকে অন্য ভাবে দেখিতাম। তদবধি দেখিলাম যে কর্মী রাখাল ধীরে ধীরে তিরোহিত হইল, আগেকার মত চাপল্য হাসি কৌতুক আর রহিল না। স্থির ভাব আসিল। কথাবার্তা একেবারে কমিয়া যাইল এবং সব সময় যেন বিভোর আত্মহারা হইয়া তন্ময় ভাবে থাকিতেন অর্থাৎ গভীর ভাবে যেন নিবিষ্ট থাকিতেন। এই সময় হইতেই সারদানন্দ, শিবানন্দ, তুরীয়ানন্দ প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে লাগিলেন, এবং সকলেই একটু সংযত ও শ্রদ্ধার ভাবে তাঁহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন। এইটি হইল তাঁহার সিদ্ধ অবস্থা। পূর্বের ন্যায় সহকর্মীরা সমভাবে কথা কহিতেন না। কিন্তু শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলিয়া সম্মান করিতেন। তিনি মনটা নামাইবার জন্য কখন কখন গাছপালা দেখা ইত্যাদি তুচ্ছ কার্য করিতেন কিন্তু অনেক সময় বিভোর তন্ময় হইয়া থাকিতেন। ইহাকে

বলে চেতন সমাধি। এই সময় হইতে তিনি ধ্যান মূর্তি হইলেন। কর্মী রাখাল রাজ আর নয়, কেবল মহাযোগী ব্রহ্মানন্দ হইলেন। তবে আবশ্যক হইলে মনটা নামাইয়া তিনি মিশনের সকল কার্যের সুচারু-পন্থা করিয়া দিতেন। এই সময় হইতে তিনি অনেককে দীক্ষা ও সন্ন্যাস দিতে লাগিলেন। তিনি কখন কাশীতে কখনও বা পুরীতে থাকিতেন এবং কলিকাতায় আসিলে অনেক সময় বলরামবাবুর বাড়ীতে থাকিতেন। তিনি যেখানেই থাকিতেন সেখানে বহু লোকের সমাগম হইত, এবং সকলেই তাঁহাকে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের মানস পুত্র বলিয়া বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিত। অবশেষে বিসূচিকা রোগে আক্রান্ত হইয়া বলরামবাবুর বাড়ীতে তাঁহার দেহত্যাগ হয়। এইরূপে এই মহাযোগী ও মহাকর্মী রামকৃষ্ণ মিশনের প্রসারণ ও সংগঠনের প্রধান উদ্যোগী ছিলেন এবং ভবিষ্যতে সকলেই তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে। তাঁহার পীড়ার কালে বিশেষতঃ রবিবার দিন অর্থাৎ শেষ দিন উপস্থিত ছিলাম এবং তাঁহার শব লইয়া বাগবাজার হইতে বরাহনগর মঠ পার হইয়া বেলুড় মঠে অগ্নি সংস্কার করা হয়।

ঊনবিংশ ভাষণ

১৯শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ সাল। ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯ খৃঃ।

প্রথম পর্য্যায়ের কর্মীরা সকলেই ধ্যানী ও যোগী হইয়াছিলেন। কাশীপুর বাগান, বরাহনগর ও আলমবাজারের মঠের সকলেই তপস্যার দিকে বিশেষ মন দিয়াছিলেন। কিন্তু স্বামীজীর আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করার পরে অপর ভাব আসিল। কর্ম ও ভাব বিকীরণ করা অর্থাৎ পূর্বে তপস্যা করিয়া যে শক্তি সঞ্চয় হইয়াছিল তাহা জগতের কাছে বিকীরণ করা অর্থাৎ জগতের লোকের কাছে শক্তির পরিচয় দেওয়া এখন একটা বিশেষ লক্ষ্য হইল। প্রচার ও নানাপ্রকার

জনহিতকর কার্য করা রামকৃষ্ণ মিশনের অঙ্গীভূত হইল। এইজন্য দ্বিতীয় পর্যায়ের লোকদিগকে কর্মী শ্রেণী বলিয়া বিভক্ত করা হইতেছে। যদিও কয়েকজন বিশেষ তাপস হইযাছিলেন এবং ভবিষ্যতেও একশ্রেণীর তাপস হইবে ও অপর শ্রেণী ভাব বিকীরক হইবে। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন ভাব লইয়া জীবনে কার্য করিবে।

জে, জে, গুড্‌উইন

এই দ্বিতীয় পর্যায়ের উল্লেখ করিতে হইলে প্রথমে গুড্‌উইনের নাম উল্লেখ যোগ্য। জে, জে, গুড্‌উইন জাতিতে ইংরাজ। Bath নগরের কাছে Froame নামক গ্রামে ইহাদের বাস ছিল। তাঁহার এক বৃদ্ধা মাতা ও দুইটি অবিবাহিতা ভগ্নী ছিলেন। তিনি ক্ষিপ্র লিপিকারের কাজ করিতেন এবং আমেরিকায় ক্ষিপ্রলিপিকারের লোকের আবশ্যক হওয়ায় গুড্‌উইন স্বামীজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন। প্রথমে বিত্তভোজী ক্ষিপ্রলিপিকার রূপে কর্ম করিয়া কয়েকদিন পর স্বামীজীর অনুগত ভক্ত হইলেন এবং তদবধি স্বামীজীর অন্তরঙ্গ হইয়া রহিলেন। নিউইয়র্ক হইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী লণ্ডনে আসিলে গুড্‌উইনও সঙ্গে আসিলেন এবং ক্ষিপ্রলিপিকারের কার্য করিতে লাগিলেন। তিনি স্বামীজীর লেকচার-এর প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত করেন। তাঁহার পরিশ্রম ও ঐকান্তিক শ্রদ্ধার দরুণ স্বামীজীর ইংরাজী বই পাওয়া যাইতেছে। ক্ষিপ্র লিখিত অনেক খাতা তাঁহার নিকট অবশিষ্ট ছিল। তাঁহার ইচ্ছা ছিল অবসর পাইলে সে সকল প্রচলিত ভাষায় লিখিয়া প্রকাশ করিবেন। কিন্তু আলমবাজারের মঠে থাকিয়া গুড্-উইন নিতান্ত ভারতীয় সাধুর ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। মেঝেতে শুইয়া থাকিতেন এবং ভাত, ডাল খাইতে আরম্ভ করিলেন। অবশেষে স্বামীজীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী বাংলা ত্যাগ করিয়া মাদ্রাজে চলিয়া যাইলেন।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী একটি উপাখ্যান বলিতেন—একদিন স্বামীজী প্রভৃতি সকলে আলমবাজারের লোচন ঘোষের ঘাটে স্নান করিতে যাইলাম। ভাটা পড়িয়া গিয়াছিল এজন্য কিনারায় পাঁক হইয়াছিল। স্বামীজী স্নান করিয়া কাদার উপর দিয়া আসিয়া ঘাটে উঠিলেন, পায়ে কাদা লাগিল কিন্তু অপর কেহ তাহা লক্ষ্য করিল না। গুড্‌উইন তাড়াতাড়ি আসিয়া নিজের বস্ত্র দিয়া পায়ের পাঁক মুছাইয়া দিয়া জুতা পরাইয়া দিলেন। ঘাটেতে সেদিন অনেক লোক স্নান করিতেছিলেন। তাঁহারা সকলে অবাক হইয়া দেখিলেন যে একজন ইংরাজ যুবক স্বামীজীর পা মুছাইয়া দিয়া জুতা পরাইয়া দিলেন। এইটি তাঁহার শ্রদ্ধা ভক্তির একটা নিদর্শন বলিতে হইবে।"

গুড্‌উইন মাদ্রাজে যাইয়া ক্ষিপ্রলিপি ভাষায় রূপান্তরের কার্য গ্রহণ করেন, এবং অবশেষে ঐ দেশেতেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। গুড্-উইনের মৃত্যুর পর মাদ্রাজের আলাসিঙ্গা সমস্ত কাগজপত্র গুড্‌উইনের মাতার কাছে পাঠাইয়া দেয়। নিবেদিতা যখন ইংলণ্ডে যান আমি তখন তাঁহাকে গুড্‌উইনের ঠিকানা দিয়া কাগজ পত্র অনুসন্ধান করিতে বলিয়াছিলাম, তদনুযায়ী তিনি Froame গ্রামে গিয়া অনু-সন্ধান করায় জানিতে পারিলেন যে তাঁহার মা ও দুই ভগ্নী অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন। সেজন্য কাগজপত্র কিছু পাওয়া যাইল না। স্বামীজীর প্রত্যেক দিনের কার্য ও কথাবার্তার পুঙ্খানুপুঙ্খ কড়চা গুড্‌উইন লিখিয়া রাখিতেন। কাগজগুলি পাইলে কয়েক সংখ্যা গ্রন্থ হইত। কিন্তু এখন তাহার কোন উপায় নাই। গুড্‌উইন এর বিষয়, "লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ" গ্রন্থে কিঞ্চিৎ বিবৃত করিয়াছি।

ক্যাপ্টেন সেভিয়ার

ক্যাপ্টেন সেভিয়ার উচ্চ বংশের ইংরাজ অর্থাৎ পুরাতন জমিদার বংশের। তিনি সিপাহী বিদ্রোহের সময় ভারতবর্ষে সৈনিকের কার্য

করিয়াছিলেন। তারপর কার্য ত্যাগ করিয়া নিজ দেশে গিয়া বাস করেন। তিনি ও তাঁহার স্ত্রী (মাদার সেভিয়ার) ইংলণ্ডে স্বামীজীর পরম ভক্ত হন। পরে তিনি সপত্নীক ভারতবর্ষে আসিয়া আলমোড়ায় আশ্রম স্থাপন করেন এবং তথায় তাঁহার দেহরক্ষা হয়। মাদার সেভিয়ার অতি দয়াবতী ও স্নেহপরায়ণা স্ত্রীলোক ছিলেন। (গ্রন্থকার প্রণীত "মায়াবতীর পথে" পুস্তক দ্রষ্টব্য।) মাতৃভাবের পূর্ণমাত্রার প্রতিমূর্তি ছিলেন। আলমোড়ার পাহাড় অঞ্চলে সকলেই তাঁহাকে মাদার বলিয়া ডাকিত ও অতিশয় শ্রদ্ধা করিত। পাহাড়ীদের যখন যে কষ্ট হইত মাদারকে বলিয়া আসিত। তিনি ঐ অঞ্চলে ভগবতীরূপা ছিলেন। পাহাড়ীরা তাঁহাকে এতই শ্রদ্ধা করিত। আমি মায়াবতী অবস্থান কালে এ সকল প্রত্যক্ষ করিয়াছি। স্বামীজীও ইহাকে মাদার বলিয়া ডাকিতেন। বয়স অধিক হওয়ায় তিনি দেশে ফিরিয়া যান ও তথায় দেহত্যাগ করেন। রামকৃষ্ণ মিশন প্রসারণ করার তিনিও একজন বিশেষ সহায়ক ছিলেন।

—বিংশ ভাষণ—

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দ।

নিবেদিতা

নিবেদিতা ইংরাজ মহিলা। স্বামীজীর লণ্ডনে বক্তৃতাদান কালে তিনি উহা শুনিতে আসিতেন এবং কলিকাতায় আসিয়া মিশনের কার্যে আত্মসমর্পণ করিলেন। ইহার নাম Margaret E. Nobel. তিনি তদবধি বাগবাজারের বোসপাড়ায় বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিতেন এবং সম্পূর্ণরূপে এদেশী হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত শক্তি ও প্রতিভা ছিল। গুরুভক্তি বলিতে হইলে তাঁহার কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। স্বামীজী যখন লাহোরে বক্তৃতা দিতে যান

নিবেদিতা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন। লাহোরের বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট শুনিয়াছি যে নিবেদিতা একদিন সকলের সম্মুখে স্বামীজীকে তামাক সাজিয়া দিলেন। ইহাতে সকলে খুব আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিল যে, একজন ইংরাজ মহিলা একজন দেশীয় লোককে তামাক সাজিয়া দিতেছেন। বেলুড় মঠে তিনি কয়েকবার স্বামীজীকে এইরূপ তামাক সাজিয়া দিয়াছিলেন। ইহা আমি কয়েকজন বিশ্বস্ত লোকের মুখে শুনিয়াছি যদিও আমি উপস্থিত ছিলাম না।

পূর্বকালে ফ্রান্সে Joan of Ark ছিলেন নিবেদিতা ঠিক তদ্রূপই হইয়া ছিলেন। প্রথম অবস্থায় কলিকাতায় যখন প্লেগ হয় নিবেদিতা, সদানন্দ গুপ্তকে সঙ্গে লইয়া মিউনিসিপালিটির ওভারসিয়ার-এর সহিত পল্লীর রাস্তা পরিষ্কার করিতেন ও পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেন। এইরূপে সেবা কার্য যে রাস্তা পরিষ্কার হইতে আরম্ভ করিতে হয় তাহাই তিনি দেখাইলেন তিনি নিজের বাড়ীতে মেয়েদের একটি স্কুল স্থাপন করিলেন এবং তথায় সরস্বতী পূজা করিতেন। সরস্বতী বিসর্জন দিয়া গঙ্গা হইতে পূর্ণকুম্ভ নিজের মাথায় লইয়া বাড়ীতে আসিতেন। স্বামীজীর দেহত্যাগের পর একমাসকাল তিনি শুধু পায়ে ছিলেন। দুঃস্থ পরিবারদের তিনি গোপনে বিশেষ সাহায্য করিতেন। নিজের বাড়ীতে শক্তিপূজার দিকে তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। অপরদিকে কখন বই লিখিতেছেন; কখন ইংরাজী সংবাদ পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেছেন, কখন বা বক্তৃতা করিতেছেন। শক্তি, শক্তি-বিকীরণ ও কার্য প্রণালী এই তিনের সমাবেশ হইয়া জীবন্ত মূর্তি ধারণ করিয়াছিলেন। আবার এদিকে গোপালের মার প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। বিশেষ একটি কথা এই যে সেই সময় বাংলা দেশে স্বদেশী আন্দোলন প্রথম হয়। Radcliff তখন Statesman-এর সম্পাদক ছিলেন। Radcliff একপ্রকার নিবেদিতার ভক্ত ও শিষ্য ছিলেন। Radcliff দম্পতি অনেক সময় রবিবার সকালে নিবেদিতার সহিত

মঠে আসিতেন। এইজন্য নিবেদিতা statesman পত্রে নাম না দিয়া অনেক প্রবন্ধ লিখিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের সময় বাঙ্গালী যুবক-দিগের ভিতর নিবেদিতা নূতন এক জাতীয় ভাব প্রজ্বলিত করিয়া দেন। তিনি অপ্রকাশ্যে সেই জাতীয় আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্ররূপ ছিলেন। তাঁহার রাজনীতি হিংসাপূর্ণ বা স্বার্থসিদ্ধির ভাব নহে। গরীব-দুঃখী নিষ্পেষিত হইতেছে—ইহাদের কি প্রতিকার করা যাইতে পারে ইহাই তিনি চিন্তা করিতেন। ভালবাসা ও ন্যায়পরায়ণতা দিয়া তিনি রাজনীতি আলোচনা করিতেন—বিদ্বেষ ভাবের নহে। এইজন্য তখনকার বিশেষ পণ্ডিত ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ হইয়াছিল। বাংলাদেশ, বোম্বাই প্রভৃতি নানাস্থানের বিশিষ্ট গণ্যমান্য লোকের সহিত তাঁহার পরিচয় ছিল। ইংরাজ মহলেও তাঁহার ঠিক সেইরূপ জানাশুনা ছিল। সংক্ষেপে বলিতে হইলে তিনি বাংলাদেশে বিশেষ করিয়া যুবকদিগের ভিতর এক নূতন ভাব উদ্বোধিত করিয়াছিলেন। শুধু বাংলাদেশ বলিলে চলিবে না। সমস্ত ভারত-বর্ষের ভিতর একটা জাগরণের আভাস দিয়াছিলেন। নূতন বাংলা সৃষ্টির তিনি একজন প্রধান নেত্রী।

স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝিতে হইলে কেবলমাত্র ভক্তের দিক দিয়া বুঝিলে চলিবে না। কিন্তু স্বামীজীর প্রণোদিত প্রত্যেক ব্যক্তির মনোবৃত্তি ও ক্রিয়া কলাপ সমবেত করিয়া কেন্দ্রীভূত করিলে স্বামী বিবেকানন্দকে বুঝিতে পারা যায়। স্বামীজী প্রত্যেক ব্যক্তিকে মনোবৃত্তি ও আভ্যন্তরিক শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন উপদেশ দিতেন। এইজন্য নিবেদিতা অপর সকল হইতে পৃথক হইয়াছিলেন। অথচ স্বামীজীর প্রতি অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি ও স্বামীজীর আদেশ যে তিনি সমস্ত জীবন পালন করিয়াছিলেন এ বিষয় সন্দেহ করিবার নাই। বহুমুখীভাবের এক একটি স্ফুলিঙ্গ দেখিলে সমস্ত বুঝা যায় না। সমস্ত স্ফুলিঙ্গগুলি কেন্দ্রীভূত করিয়া লইলে তবে বুঝা যায়। নিবেদিতার

অদ্ভুত শক্তি ও ভারতের প্রতি যে কিরূপ ভালবাসা ছিল তাহা অতুলনীয়। বাংলাদেশকে তিনি একটা নূতন পথে চালাইয়া গিয়াছিলেন এইজন্য তাঁহাকে বাংলার Joan of Ark বলা যাইতে পারে। আনন্দের বিষয় এই যে ফরাসী দেশীয় পণ্ডিত Jean Herbart একদিন সস্ত্রীক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিয়া বলেন যে তাঁহারা নিবেদিতার একটি বিশেষ জীবনী রচনা করিতেছেন এবং দুই সহস্র পত্রাদি সংগ্রহ করিয়াছেন: এস্থলে আমি সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলিলাম। রামকৃষ্ণ মিশনের যে বহুমুখী ভাব, নিবেদিতা তাহার একটি উদাহরণ স্বরূপ।

খৃষ্টিনা

Christina Green Styddle ইনি জার্মান আমেরিকান। তিনি অতি বিদুষী মহিলা ছিলেন। পূর্বে তিনি একটি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষা (Principal) ছিলেন, এইরূপ আমি শ্রুত আছি। পরিশেষে ভারতবর্ষে আসিয়া কিছুদিন মায়াবতীতে থাকেন। অবশেষে নিবেদিতার সহিত একসঙ্গে থাকিয়া শিক্ষয়িত্রীর কার্য করেন। ইনি যেমনি বিদুষী তেমন ধীর, নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। নিবেদিতার হইল রুদ্রাণীর ভাব। খৃষ্টিনার হইল কোমল ভাব। আমি অনেক সময় খৃষ্টিনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতাম। তিনি স্বামীজীর আদেশ পালন করিবার জন্য কি কষ্টই না স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আমি ছেঁড়া জুতা ছেঁড়া কাপড় পরিয়া থাকিতে দেখিয়াছি। আহারাদিরও তদ্রূপ কষ্ট হইয়াছিল। নিবেদিতা দার্জিলিং-এ দেহত্যাগ করিলে খৃষ্টিনা অধীরা হইয়া পড়িয়াছিলেন, এবং অন্য বাড়ীতে স্কুল স্থাপনের বন্দোবস্ত করিয়া দিয়া শরীর অসুস্থ হওয়ায় আমেরিকা চলিয়া যান। তিনি পুনরায় আর একবার আসিয়াছিলেন, কিন্তু অল্পদিন পরে চলিয়া যান। স্বামীজী ও রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য

নিবেদিতা ও খৃষ্টিনা সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন। অবশেষে দুইজনেই অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ধন্য এই মহিলারা। তাঁহাদের নাম ও স্মৃতি চিরকাল থাকিবে। ভবিষ্যতে ইহারা সকলের প্রণম্য হইবেন।

মিস্ মুলার

'লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ' গ্রন্থে ইঁহার অনেক উল্লেখ আছে। তিনি স্বামীজীর সহিত ভারতে আসেন ও অল্পদিন থাকিয়া চলিয়া যান। তাঁহার বিষয় উল্লেখ করিবার কারণ এই যে তিনি প্রথম অবস্থায় অর্থ দিয়া মঠ স্থাপনের সাহায্য করিয়াছিলেন।

Charls Johnson
সন্ন্যাস নাম অমৃতানন্দ

ইনি জাতিতে আসলে নরউইজিয়ান। শৈশবে বাপ-মার সহিত আমেরিকায় আসিয়া বাস করেন এবং cowboy বা গোচারকের কাজে লিপ্ত হন। তিনি অতি দীর্ঘাকৃতি ও বলিষ্ঠ পুরুষ ছিলেন। ফিলি-পাইনের লড়াই-এর সময় রুজভেল্ট এর অশ্বারোহী সৈন্যভুক্ত ছিলেন। নূতন ঘোড়াকে জঙ্গল হইতে ধরিয়া তখনই তাহাকে আয়ত্ত করিয়া কি করিয়া তার উপর চড়া যাইতে পারে এই বিষয় তিনি নিপুন ছিলেন। পরে আমেরিকায় তিনি Immigration Interpreter অর্থাৎ দো-ভাষীর কার্য করিয়াছিলেন। স্বামীজীর সহিত তাঁহার আমেরিকায় সাক্ষাৎ হয়। তদবধি সন্ন্যাস লইয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসেন। স্বামীজী ও হরি মহারাজের প্রতি তাঁহার অগাধ শ্রদ্ধা ভক্তি ছিল। তিনি মায়াবতীর আশ্রমেই বেশী থাকিতেন এবং কখন কখন বা বেলুড় মঠে থাকিতেন। অবশেষে তিনি আমেরিকায় ফিরিয়া দেহত্যাগ করেন। আমেরিকান সৈনিক পুরুষদের ভিতরও স্বামীজী

নিজের ভাব দিয়াছিলেন। এইটি একটি বিশেষ লক্ষ্যের বিষয়। অমৃতানন্দ বা Charls Johnson প্রথম অবস্থায় বেলুড় মঠে অতি কঠোরী সাধু ছিলেন পরিশেষে শরীর অপটু হওয়ায় তিনি আহারাদি করিতে লাগিলেন, কিন্তু স্বামীজীর ও হরি মহারাজের কঠোর বৈরাগ্যের ভাব তাঁহার ভিতর বিশেষ করিয়া প্রবেশ করিয়াছিল।

গুরুদাস (Charls Havdjlom)
(চার্লস হ্যাভ্‌লম্)

সন্ন্যাস নাম অতুলানন্দ কিন্তু ইনি গুরুদাস নামে পরিচিত। ইনি হইলেন ডাচ্ আমেরিকান। ইনি অতি কঠোরী সাধু এবং হরি-মহারাজের আদর্শে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন ; যদিও তিনি অভেদানন্দের নিকট হইতে ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অদ্যাপি * জীবিত আছেন এবং অধিকাংশ সময় আলমোড়াতে থাকেন। কন্‌খলে দেখিলাম যে তাঁহাকে সমস্ত সাধুরা আত্মগোষ্ঠী বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বিদেশী বলিয়া কোন পার্থক্য রাখেন নাই। তিনি অতি উচ্চ মার্গের লোক। এইরূপে রামকৃষ্ণ মিশন কিরূপে বিদেশী লোকদ্বারা প্রসারিত হইতেছে তাহাই সংক্ষেপে বলিলাম।

Francis John Alexander.

ফ্রান্‌সিস্ জন আলেকজাণ্ডার নামক এক মার্কিন যুবক মঠে আসিল। মাদার সেভিয়ার আদর করিয়া তাঁহাকে ফ্রাঙ্ক বলিয়া ডাকিতেন। তদবধি তিনি সেই নামেই পরিচিত হইয়াছিলেন। ফ্রাঙ্ক কখন বাগবাজারের বসুদের বাড়ী থাকিতেন কিন্তু অধিকাংশ সময় মায়াবতী ও আলমোড়ায় থাকিতেন। বিরজানন্দের সহকর্মী হইয়া স্বামীজীর জীবনী ইংরাজিতে লিখিয়াছিলেন। ভারতীয় সাধু-

* ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে।

দিগের ন্যায় কঠোরতা করায় ফ্রাঙ্কের শরীর ভাঙিয়া যায় এবং আমেরিকায় প্রত্যাবর্তন করিয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। যদিও কয়েক বৎসর মাত্র মিশনের সম্পর্কে ছিলেন কিন্তু স্বামীজীর জীবনী লিখিয়াছিলেন এইজন্য তাঁহার নাম উল্লেখ করা হইল।

একবিংশ ভাষণ

২১শে অগ্রহায়ণ, ১৩৪৬ সাল। ৭ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯ খৃঃ।

গুপ্তর কথা

সদানন্দ (গুপ্ত) যদিও বরাহনগর মঠে আসিয়াছিলেন কিন্তু তাঁহাকে দ্বিতীয় পর্যায় ভুক্ত করা যায়। তিনি নিবেদিতার সহিত রাস্তা ঘাট পরিস্কার কার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। ভাগলপুরে যখন মহামারী হয় তখন তিনি কয়েকজন সহকর্মী লইয়া নানা সেবাকার্য করিয়া ভাগলপুর প্লেগ মুক্ত করিয়াছিলেন। এইরূপে কয়েকবার আর্তত্রাণ করিয়া তাঁহার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া যায় কারণ পূর্বে তিনি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন। কয়েক বৎসর শয্যাশায়ী থাকিয়া পরে মারা যান। বাগবাজারের বোস পাড়ার বাড়ীতে তিনি শেষ অবস্থায় ছিলেন এবং আমি প্রত্যহ তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। এইরূপ কঠোর শরীরের যন্ত্রণায়ও তিনি অনবরত জপ করিতেন। মৃত্যুর দিন তাঁহার এক আশ্চর্য ব্যাপার দেখিয়াছি। কবিরাজ দুর্গাপ্রসাদ সেন নাড়ী দেখিয়া বলিলেন যে নাড়ী আর নাই। কবিরাজী শাস্ত্র মতে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। নাড়ী আর চলাচল করিতেছে না অথচ তিনি জপ করিতেছেন ও কবিরাজ মহাশয়ের সহিত কথা বলিতেছেন। কবিরাজ মহাশয় বাহিরে আসিয়া বলিলেন যে ইঁহাকে নিয়া যাইবার বন্দোবস্ত কর। যোগীর মৃত্যু অতি আশ্চর্য দেখিতেছি।

নাড়ী নাই অথচ জ্ঞান আছে ও জপ করিতেছে। ঠোঁট নড়িতে লাগিল এবং ক্রমে ক্রমে ঠাণ্ডা হইয়া যাইল। তাঁহাকে কাশীপুর ঘাটে অগ্নি সংস্কার করা হয়। এইরূপে সদানন্দ (গুপ্ত) রামকৃষ্ণ মিশনের জন্য প্রাণ দিয়াছিল। "স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলীতে" তাঁহার বিশেষে উল্লেখ আছে। *

শুদ্ধানন্দ

সুধীর বরাহনগর মঠে বাল্যকালে কয়েকবার আসিয়াছিল। পরিশেষে স্বামীজী আমেরিকা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তিনি স্বামীজীর সমস্ত ইংরাজী গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ত্রিগুণাতীতানন্দ (সারদা) আমেরিকা যাইলে শুদ্ধানন্দ উদ্বোধন পত্রের ভার গ্রহণ করেন। এই সময় তাঁহার জীবনটা যেমন কষ্টকর অপর দিকে তেমনই মহিমান্বিত হইয়াছিল।

এই সময় উদ্বোধনের কোন আয় ছিল না। সকলই বে-বন্দোবস্ত। কম্বুলীটোলায় একটা বাড়ীতে তখন উদ্বোধন আফিস। শুদ্ধানন্দ দিনের বেলায় একজনের বাড়ীতে খাইতেন, রাত্রে অপরের বাড়ীতে খাইতেন। একটা ছেঁড়া পটুর জামা সম্বল ছিল এবং দিনেরবেলা সেটা গায়ে দিতেন, রাত্রে সেটা গায়ে মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেন। উদ্বোধন কাগজের তাড়া বগলে লইয়া তিনি লোকের বাড়ীতে গ্রাহক সংগ্রহ করিতে যাইতেন। কিন্তু এ অবস্থায়ও তিনি সদা প্রফুল্ল ছিলেন। তিনি কর্মী ও তাপস যুগপৎ হইয়াছিলেন। তাঁহার এই কঠোর তপস্যা বলে উদ্বোধনের প্রসারণ হইল ও অর্থাগম হইল। তারপর নানা পুস্তকাদি মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইতে লাগিল। তিনি মিশনের নানা কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ক্রমে তিনি মিশনের সেক্রেটারী ও প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বে তিনি আমার

* গ্রন্থকার প্রণীত "গুপ্ত মহারাজ" দ্রষ্টব্য।

সহিত সাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি রামকৃষ্ণ মিশন প্রসারণের একজন বিশেষ সহায়ক হইয়াছিলেন।

সুশীল

প্রকাশানন্দ, ইনি শুদ্ধানন্দের ভাই। সন্ন্যাস লইবার পর কিছুদিন এই দেশে কার্য করিয়া আমেরিকা যান এবং বহু বৎসর আমেরিকায় থাকিয়া একবার ভারতবর্ষে ফিরিয়া কয়েক মাস থাকিয়া আবার আমেরিকা যান এবং তথায় তাঁহার দেহত্যাগ হয়।

অজয়

স্বরূপানন্দ, ইনি মায়াবতী আশ্রমের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং "প্রবুদ্ধ ভারতের" প্রতিষ্ঠাতা। মায়াবতী আশ্রমের উন্নতি কল্পে তিনি জীবন যাপন করিয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার আলমোড়াতে দেহত্যাগ হয়।

খগেন

বিমলানন্দ, ইনি মায়াবতী আশ্রম প্রতিষ্ঠার অন্যতম কর্মী। কার্যপটুতা অতিশয় মিষ্ট ছিল এবং অক্লান্ত কর্মী। কিছুদিন মঠে থাকিয়া তিনি পুনরায় মায়াবতীতে চলিয়া যান। অবশেষে মায়াবতীতে তাঁহার দেহাবসান হয়। ইনি বোধানন্দ (হরিপদর) জ্ঞাতি ভাই এবং পিতার নাম বেণীমাধব চাটুজ্যে।

কল্যানানন্দ, নিশ্চয়ানন্দ

কল্যাণ ও নিশ্চয় কনখলে আশ্রম স্থাপন করিয়া সমস্ত জীবন পরিশ্রম করতঃ আশ্রম প্রসারণান্তে উভয়েই তথায় দেহত্যাগ করেন।*

* গ্রন্থকার প্রণীত—"নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান" দ্রষ্টব্য।

চারু (শুভানন্দ)

ইনি কাশীর সেবাশ্রম উন্নত করিয়া কনখলে দেহত্যাগ করেন।

কেদার (অচলানন্দ)

কাশীর আশ্রম, চারু, কেদার, ভক্তরাজ ও অপর কয়েকজন মিলিয়া প্রথম স্থাপন করেন এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ শক্তি অনুযায়ী ও কঠোর পরিশ্রম করিয়া কাশীর আশ্রম পরিবর্দ্ধন করেন।

দেবতা (পঞ্চানন)

এলাহাবাদে মুঠিগঞ্জের আশ্রমে থাকিতেন। দেবতা, বিজ্ঞানানন্দের সহকারীরূপে অনেক বৎসর কাজ করিয়া উভয়েই দেহত্যাগ করেন।

নাড়ু ও শ্রীশ

বৃন্দাবনে নাড়ু ও শ্রীধরানন্দ (শ্রীশ) ও অপর কয়েকজন মিলিয়া বৃন্দাবন আশ্রম স্থাপন করিয়াছিলেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই আশ্রম পরিবর্দ্ধন করেন। আমি বৃন্দাবনে সাত আট মাস ছিলাম এবং কর্মীরা কি প্রকার পরিশ্রম করে তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। প্রত্যেকেই প্রশংসনীয় কার্য করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত আর্তত্রাণ কার্যে অনেকেই প্রাণপণ পরিশ্রম করিয়া কার্য করিয়াছিলেন। ভাগলপুর মহামারীতে, দামোদর বন্যাতে, ভুবনেশ্বরে মন্বন্তরে, কাঙ্গরায় ভূমিকম্পে ইত্যাদি বহুস্থানে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা প্রাণ দিয়া কার্য করিয়াছে প্রত্যেকের কার্য অতি প্রশংসনীয় হইয়াছিল। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও নাম নাই কেবল রামকৃষ্ণ মিশনের নাম আছে।

নিঃস্বার্থ কর্ম কাহাকে বলে, গীতার আদর্শ কর্মী কাহাকে বলে এই রামকৃষ্ণ মিশন তাহার পরিচয় দিয়াছে। মান যশ ও প্রতিষ্ঠা সকলই ত্যাগ করিয়া মহৎ উদ্দেশ্যের জন্য সকলেই পরিশ্রম করিয়াছে। সমষ্টির উন্নতি ও বিকাশ—ব্যক্তিগত ভাবে কাহারও নাম নাই। রামকৃষ্ণ মিশন জগতকে এই আদর্শ শিক্ষা দিয়াছে। অনেক সময় লোমহর্ষ ও দুরূহ কার্যের ভিতর কি করিয়া প্রাণ উপেক্ষা করিয়া অপরকে রক্ষা করিয়াছে সে বিষয় আমি নিজে উপস্থিত থাকিয়া দেখিয়াছি। কিন্তু এস্থলে ইহা বলা বাহুল্য কারণ রামকৃষ্ণ মিশনের চিরন্তন প্রথা নিজের প্রাণ না দিলে অপরের প্রাণ রক্ষা হয় না। এই মহান আদর্শ রামকৃষ্ণ মিশন জগতে প্রচার করিতেছে।

আমি সংক্ষেপে কয়েকজন কর্মীর নাম মাত্র উল্লেখ করিলাম কিন্তু প্রত্যেকের জীবনী পৃথকভাবে লেখা আবশ্যক। যদি ভবিষ্যতে কেহ প্রত্যেক কর্মীর সংক্ষেপ জীবনী স্বতন্ত্র ভাবে লিখেন তাহা হইলে তিনি আশীর্বাদ পাইবেন এবং মহৎ উদ্দেশ্য সাধন করিবেন।

আমার অনবধানতা ও বিস্মৃতি বশতঃ যে সকল কর্মীর নাম উল্লেখ করা হয় নাই তাঁহারা যেন আমার এই ত্রুটী মার্জনা করেন এবং ভবিষ্যতে কোন ব্যক্তি যেন পরিত্যক্ত ব্যক্তিদিগের নাম সন্নিবেশীত করিয়া একটি জীবনী-তরঙ্গ লিখিয়া সকলকে বাধিত করেন। তাহা হইলে ভবিষ্যৎ জগৎ বুঝিবে যে রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা নির্বাক ও অরব ভাষায় কিরূপ মহান কার্য করিয়াছে তাহা জগতে এক আদর্শ হইয়া থাকিবে। রামকৃষ্ণ মিশন যে এক অভিনব ভাবের সৃষ্টি করিয়াছে ইহা ভবিষ্যৎ জগৎ বুঝিবে।

ব্রহ্মানন্দর সিদ্ধ অবস্থার দুই একটি কথা এস্থলে সন্নিবেশিত হইল।

একবার পয়লা বৈশাখ আমি অতি প্রত্যূষে উঠিয়া মঠের ভিতরকার দালানে বসিয়া আছি, সবে প্রভাত হইয়াছে। এমন সময় একজন বাঙ্গালী হিন্দু ভদ্রলোক আসিয়া আমায় গোপনে বলিলেন যে ঢাকার নবাবের মেয়ে আরও কয়েকজন হিন্দু স্ত্রীলোকের সহিত ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে পয়লা বৈশাখ প্রণাম করিতে আসিয়াছেন। দেখিলাম বেলতলার কাছে তিনখানা গাড়ী রহিয়াছে এবং কয়েকজন মহিলা গাড়ী হইতে নামিলেন। আমি ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে ডাকিয়া দিলে তিনি বেলতলার দিকে যাইলেন। কি কথাবার্তা হইল কিছুই প্রকাশ পাইল না। তবে ঢাকার নবাবের মেয়ে ও অপর কয়েকজন মহিলা তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ে টাকা দিলেন। সর্বসমেত টাকা প্রায় দেড়শতের ভিতর হইবে। প্রায় পনর কুড়ি মিনিট কথাবার্তা হইয়াছিল। ঐ বিষয় কাহারও জানা নাই কারণ আমরা কেহ ও দিকে যাই নাই। হিন্দু ভদ্রলোকটি আরও বলিলেন যে নবাবের মেয়ে অন্য হিন্দু মহিলাদের সহিত ঠাকুর ঘরে আসিয়া প্রণাম করিয়া গিয়াছেন। তবে মুসলমান সমাজের অন্যপ্রকার নিয়ম এজন্য তিনি প্রকাশ্যে আসিতে পারেন নাই, কিন্তু যখনই আসেন গোপনে আসেন। ব্রহ্মানন্দের সিদ্ধ অবস্থায় এমন প্রভাব হইয়াছিল যে এমন বড় ঘরের মেয়েও তাঁহাকে বৎসরের প্রথম দিনে প্রণাম করিয়া যাইলেন।

এই সময় তাঁহার এমন একটা শক্তি আসিয়াছিল ও অর্থনীতির ভাবটা এত প্রখর হইয়াছিল যে তিনি যে কোন কার্য করিতে ইচ্ছা করিতেন তাহাতে যতই অর্থব্যয় হউক না কেন, অনায়াসে নানা স্থান হইতে অর্থ আসিত। অর্থনীতিতে তিনি যে অদ্ভুত উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন এবিষয় তাহার বিশেষ প্রমাণ হইল যে রামকৃষ্ণ মিশন তাঁহার সময়েতে এত প্রসারণ লাভ করিয়াছিল এবং নানাস্থানে আশ্রম স্থাপন, নিত্যব্যয় সঙ্কুলন করা আর্তত্রাণে যে প্রভূত অর্থব্যয় হইয়াছিল

সমস্তই তাঁহার শক্তিতে হইত। এবিষয়ে কাহারও আর সন্দেহ নাই। একটি বিশেষ বিষয় এসময় দেখিয়াছি যে তিনি ইচ্ছা করিলে কাহারও প্রতি শক্তি সঞ্চার করিতে পারিতেন। এবিষয়ে আমি বিশেষ জানি যে তিনি স্পর্শ করিয়া অপরের ভিতর শক্তি সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন এবং সেই লোকটি দুই তিনদিন বিভোর অবস্থায় ছিল।

আর একটি কথা তিনি যেখানে বসিতেন চতুর্দিকের বায়ুটা যেন শক্তিপূর্ণ হইয়া উঠিত। অতলোক কাছে বসিয়া থাকিত কিন্তু তাঁহার আদেশ না পাইলে কেহ যেন কথা কহিতে সাহস পাইত না। একটা মহাশক্তিমান পুরুষের কাছে সকলে বসিয়া আছে এটা যেন সকলে বুঝিতে পারিত। এ অবস্থাটা তাঁহার শেষ কয়েক বৎসর হইয়াছিল। অনেক সময় তিনি তন্ময় বিভোর হইয়া থাকিতেন, যেন দেহে তাহার মন নাই। এই কয়টি লক্ষণ বলিলাম, তিনি শেষ অবস্থায় সিদ্ধযোগী হইয়াছিলেন এবং সকলে তাঁহাকে বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিত।

এস্থলে একটি কথা বলা আবশ্যক যে ব্রহ্মানন্দের অদ্ভুত বিবেচনা শক্তিতে, সারদানন্দ ও অপর সকলের অক্লান্ত পরিশ্রমে বরাহনগরের এই সামান্য মঠ হইতে এরূপ বিশাল প্রতিষ্ঠানে উপনীত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে আরও কত হইবে তাহা নির্ণয় করা যায় না। সামান্য বীজ হইতে এই বিশাল মহীরূহ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রত্যেক কর্মী মহান, প্রত্যেক কর্মী প্রশংসনীয় ও কীর্ত্তিমান হইয়াছেন। ভবিষ্যৎ জগৎ এই সকল কর্মীদের কাছে মস্তক অবনত করিবে এবং জাতির ভিতর এই সকল কর্মী আদর্শ হইয়া থাকিবেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের শক্তি ভারতবর্ষকে প্লাবিত করিয়া বিভিন্নরূপে কিরূপে যাইতেছে এইটি চিন্তা করিবার বিষয়। প্রত্যেকেই যেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের,

স্বামীজীর, ব্রহ্মানন্দের শক্তি পান, প্রত্যেকেই যেন যশস্বী ও আদর্শ পুরুষ হইতে পারেন। রামকৃষ্ণ মিশন জগতের এক কেন্দ্রস্থল হউক।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ

শিব ওঁ।